বিদূষক

বিদূষক

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়



পরিবেশক ·
আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
কলিকাতা - ৯

প্রকাশক : লিপিকা—
শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ বসু
৯, এণ্টনিবাগান লেন
কলিকাতা-৯

মুদ্রক : শ্রীননীমোহন সাহা
রূপশ্রী প্রেস প্রাইভেট লিমিটেড
৯, এণ্টনিবাগান লেন
কলিকাতা-৯

বেঁধেছেন : জি রায় এণ্ড কোং
২২, বুদ্ধু ওস্তাগর লেন
কলিকাতা-৯

প্রচ্ছদপট অঙ্কন : পূর্ণেন্দু পত্রী

মূল্য—দু টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা

কথাশিল্পী

সন্তোষকুমার ঘোষ

বন্ধুবরেষু

একটি শারদীয়া সংখ্যায় 'বিদূষক' উপন্যাসটির প্রথম খসড়া প্রকাশিত হয়েছিল। গ্রন্থবদ্ধ করবার সময় এটিকে অনেকখানি সংশোধন করেছি — গল্পটি আয়তনেও কিছু বড় হয়েছে।

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

কলকাতা

অগ্রহায়ণ, ১৩৬৬

॥ এক ॥

ছেলেবেলা থেকেই আমি লোককে খুব হাসাতে পারি।

আর ছেলেবেলাই বা কেন বলি? আমার জন্মের পরেই মা মারা যায়। শুনেছিলুম মার কী অসুখ করেছিল। কিন্তু আমি তা বিশ্বাস করি না। আসল কারণটা আমি জানি। আমার চেহারা দেখেই হাসতে হাসতে মরে গিয়েছিল মা।

আমার চওড়া চ্যাপটা নাকটা ওপরের পুরু পুরু ঠোঁটের সঙ্গে প্রায় সমতল। কানের তলার অংশটা মাথা নাড়ালে ছাগলের মত লটর-পটর করে। থুতনির বালাই নেই, প্রায় মুখের তলা থেকে সেটা নেমে গেছে গলার দিকে। দু হাতে ছটা করে আঙুল। গায়ের রঙ পুরনো তামার মত অদ্ভুত আর অস্বাভাবিক।

আমি জন্মেছিলুম শেষ রাতে। শুনেছিলুম, সেই সময় গ্রামের পথ দিয়ে বিকট হরিধ্বনি তুলে মড়া যাচ্ছিল একটা। একদল শেয়াল হঠাৎ কঁকিয়ে কেঁদে উঠেছিল বাড়ির পেছনে আশ-স্যাওড়ার বনে। আঁতুড়ঘরের মিটমিটে আলোয় দাই দারুণ ভয়ের চমকটা সামলে নিতে না নিতে, আমি পৃথিবীতে এসেছিলুম।

হাউমাউ করে কেঁদে উঠেছিল দাই ঃ ও মা গো—একি! রাক্ষস এসে জন্মালো নাকি!

দাইয়ের কথা প্রমাণ করবার জন্যই বোধ হয় তিন দিনের মধ্যে মা মরে গেল।

পরে শুনেছিলুম, সকলেরই আশা ছিল আমি বাঁচব না। এমন অদ্ভুত চেহারার ছেলে নাকি বাঁচে না। কিন্তু আমি ঠিকই বেঁচে গেলুম। সব শত্রুর মুখে ছাই দিয়ে বাড়তে লাগলুম শশিকলার মত।

শশিকলার মত উপমাটা ঠিক হল না। আমি চাঁদের উলটো—রাহু বললেই ঠিক হয়। কিন্তু রাহুর হ্রাস-বৃদ্ধি নেই, অতএব ও উপমাটা অচল। তাই নিজের সম্পর্কে একটুখানি অতিশয়োক্তি করতে হল।

মা মারা যাবার পরে রাগ করে বাবা বলল, আমি ওর মুখদর্শন করব না আর।

মা বেঁচে থাকলেও আমার মুখ খুব দেখবার মত নয়—বাবাকে দোষ দিতে পারি না। কিন্তু যে দেখল সে আমার বিধবা পিসিমা। আমার ঠাকুরদার পেশা ছিল সামান্য যজমানী, কিন্তু কুলের গর্ব ছিল রাজ-রাজড়ার মত। তাই ঠাকুরদা খুঁজে-পেতে খড়দার কোন এক নৈকষ্য কুলীনের সঙ্গে পিসিমার বিয়ে দিয়েছিল। কুলীনটির কুল ছিল, ঘরে স্ত্রী ছিল, চারটে বড় বড় ছেলে ছিল, ছিল না কেবল বয়েস। তাই বিয়ের দু বছর যেতে না যেতে তার অকালে গঙ্গালাভ হল। তার ছ মাস পরে পিসিমার সতীন একদিন দুই ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে পিসিমাকে এমন মার মারল যে, মুখ দিয়ে রক্ত ছুটল। কাঁদতে কাঁদতে পিসিমা চলে এল আমাদের বাড়িতে। সেই থেকেই আছে।

মরা মানুষের দোষ ধরতে নেই। কিন্তু লোকে বলে, মাও নাকি খুব খারাপ ব্যবহার করত পিসিমার সঙ্গে। ভীষণ কুঁড়ে ছিল মা। ভাত চড়িয়ে দিয়ে আঁচল পেতে ঘুমোল তো ঘুমোলই, ভাত পুড়ে আংরা হয়ে গেল—মার খেয়াল নেই। বাগানে গরু ঢুকে লাউ-কুমড়ো গাছ মুড়িয়ে খেল, মা বারান্দাতে বসেই হেই-হেই করছে, গরু নিশ্চিন্ত মনে বাগান উজাড় করে ভরপেট খেয়ে আরামে পান চিবুনোর মত জাবর কাটতে কাটতে চলে গেল; মা বসে বসেই গলা ফাটিয়ে গরুর সাত পুরুষ উদ্ধার করতে লাগল—নেমে একটুখানি তাড়িয়ে দিলে এমন কাণ্ডটা ঘটত না। শুনেছি, বাবার মত ঠাণ্ডা মানুষও এক-একদিন মাকে ধরে ঠেঙিয়ে দিত। মার খেয়ে মা ডাক ছেড়ে কান্না জুড়ত, কিন্তু গা লাগিয়ে কাজ করত না।

এমনিতেই মা এই রকম, পিসিমা আসবার পরে তো সাপের পাঁচ পা দেখল। কুটোটি ভেঙে অবধি সরায় না। পুকুর থেকে জল আনা, দু বেলা রান্না, বাসন মাজা সবই পিসিমা করত। এমন কি, একাদশীর দিনেও পিসিমার ছুটি ছিল না। প্রায় সমস্তটা দিন নির্জলা উপোস করে সন্ধ্যায় একটুখানি মুখে দিতে বসেছে, ঠিক তখন একটা তুচ্ছ ত্রুটি নিয়ে মা হয়তো

এমন যাচ্ছেতাই গালাগাল দিতে লাগল যে জলটুকুও আর পিসিমার গলা দিয়ে গলল না।

এক-একদিন কেঁদেকেটে পিসিমা বলত : এ আর সয় না—যা থাকে কপালে, শ্বশুরের ভিটেতে গিয়েই পড়ে থাকব।

মা অমনই ভেংচি কেটে বলত : বেশ তো, যাও না চলে। খবর পাঠিয়ে দাও। তোমার সৎ-ব্যাটারা এসে এক্ষুনি ঢাক-ঢোল বাজাতে বাজাতে চতুর্দোলায় চাপিয়ে তোমাকে নিয়ে যাবে।

পিসিমা চোখের জল মুছতে মুছতে এককাঁড়ি এঁটো বাসন নিয়ে রওনা হত ঘাটের দিকে।

পাড়ার মেয়েদের কারও কারও অসহ্য হয়ে উঠত কখনও কখনও। বলত, তোমাদের বাপু এ সব বড় অন্যায়। একটা বামুনের বিধবাকে দিয়ে মাছের এঁটো-কাঁটা না ছোঁয়ালেই তো পার।

কুঁড়ে হলে ঝগড়ার গলা চড়া হয়, মারও সে গুণ ছিল। তক্ষুনি তুরুক জবাব দিয়ে বলত, বেশ তো বাছা, এতই যদি দরদ, নিজেরাই এসে বাসন কখানা মেজে দিয়ে যাও না।

বাবা দেখেও দেখত না। নামমাত্র মাইনেয় স্কুলের থার্ড পণ্ডিত। সেক্রেটারির ছেলেকে পড়াত দু বেলা, ওরই ফাঁকে ফাঁকে যজমানীও করত। সংসার চালাতেই প্রাণান্ত, এ সব দেখবে কখন? রাতে বাড়ি ফিরে নাক ডাকিয়ে ঘুমোত। (বাবার নাক-ডাকানো বিখ্যাত ছিল, লোকে বলত, থার্ড পণ্ডিতের নাকের আওয়াজে পাড়ায় চোর আসে না।) তার মার চেঁচামেচিতে ঘুমে বাধা পড়লে এক-একদিন উঠে মার চুলের মুঠি ধরে ঘা কয়েক বসিয়ে দিত।

তাই মা যখন মরে গেল, তখন বাবার কোনও অসুবিধে দেখা গেল না। বরং শান্তিতে ঘুমিয়ে বাঁচল। আর হাড়ে বাতাস লাগল পিসিমার। থার্টুনিও একটু বাঁচল, গাল-মন্দের হাত থেকেও রেহাই পেল। আর আমার ওপর রাগ করে বাবা যখন বলল, ওই ভূতের বাচ্চাটার আমি মুখ দেখব না (অবশ্য বাবা যে খুব সুপুরুষ, সে অপবাদ অতি বড় শত্রুতেও দেবে না), তখন পিসিমাই আমাকে দু হাত বাড়িয়ে বুকে টেনে নিল।

কিন্তু মনের মধু দিয়ে তো পিসিমা শুকনো বুক ভরে তুলতে পারে না। তাই পলতে দিয়ে আমাকে ছাগলের দুধ খাওয়াত। প্রতিবেশিনীরা যদি

বলত, ওই তো ছেলের ছিরি, ওকে আর অত করে বাঁচিয়ে কি লাভ, তা হলে পিসিমা আগুনের মত জ্বলে উঠত।

পুরুষ মানুষ, রূপ নিয়ে কি ধুয়ে খাবে? দেখ, ভগবানের দয়ায় ও দশজনের একজন হবে, লোকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখবে ওকে। তারাও স্বীকার করত সে কথা। বলত, তাকিয়ে তাকিয়ে যে দেখবে তাতে আর সন্দেহ কি। আর দশজনের একজন কেন, লাখেও এর জুড়ি মেলে না।

পিসিমা চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বলত, তোমাদের এত গায়ের জ্বালা কেন বাছা? নাওয়াও-খাওয়াও না, বিছানা-কাঁথাও কাচতে হয় না। খামোকা কেন বলতে আস এ সব?

পিসিমার হাতেই আমি বড় হতে লাগলুম। লোকে যত বেশী বলত আমার বাঁচবার কোনও দরকার নেই, পিসিমার যেন ততই আমাকে বাঁচাবার জন্যে জেদ বেড়ে যেত। একদিন একটুখানি জ্বর হয়েছে কি আর কথা নেই, সারাটা রাত জেগে বসে রইল মাথার কাছে, দু চোখের পাতা এক করল না।

আমি জানি, কেন এত করত আমার জন্যে। আমার মতই পৃথিবীতে সেও ছিল অনাবশ্যক, তাকেও সবাই ভার মনে করত। তাই আমার মধ্যে সে যেন নিজেকেই দেখতে পেয়েছিল। আমাকে বাঁচানোর চেষ্টার ভেতর দিয়ে পিসিমা যেন নিজের জোরটাকে প্রকাশ করতে চাইত, এতদিন যে উপেক্ষা আর অনাদর পেয়ে এসেছে সকলের কাছ থেকে, তারই যেন জবাব দিতে চাইত।

আমি যদি খুব সুন্দর, সুপুরুষ হতুম? আমি জানি, পিসিমা ফিরেও তাকাত না। আমাকে যদি সকলে আদর করত, পিসিমা বুঝত, সংসারে তাকে অবজ্ঞা করার দলে আরও একজন বাড়ল। বুঝত আমি ভিন্ন গোত্রের, ওর কেউ নয়। কিন্তু আমাকে কেউ চাইল না বলেই পিসিমা চাইল, আমাকে আশ্রয় করেই দাঁড়াতে চাইল সে।

ক্রমে ক্রমে বাবারও আমাকে অভ্যেস হয়ে এল। নিতান্তই যখন টিঁকে গেলুম, তখন বোধ হয় তার মনে হল, চেহারা আমার যেমনই হোক—সন্তান যখন, পরলোকের পিণ্ডটা অন্ততঃ দিতে পারব। বাবার আমার দিকে চোখ পড়ল।

পিসিমার ছাগলের দুধের গুণ আছে। আশ্চর্য স্বাস্থ্য হল আমার। রাক্ষস বলেই বোধ হয় রাক্ষসের মত শক্তি হল গায়ে। যখন হামা দিচ্ছি,

তখনই আমাকে কোলে তুলতে পিসিমার কাঁকাল বেঁকে যেত। বলত, বাপ রে, যেন বিশ মণ ভার!

আরও একটা জিনিস ছিল আমার। আমি কখনও কাঁদি নি।

খুব ছেলেবেলার কথা জানি না, কিন্তু একটু বড় হতেই আমার স্বভাবের একটা দিক ফুটে উঠল। ছুরি দিয়ে ছ আঙুলের একটার প্রায় আধখানা নামিয়ে ফেলেছিলুম একদিন। ঝর্‌ঝর্‌ করে রক্ত নামল, রাঙা হয়ে গেল মেঝে। কপাল চাপড়াতে চাপড়াতে ছুটে এল পিসিমা—আর হাউ-হাউ করে কান্না। কিন্তু আমি তখন হাসছিলুম। কাটা আঙুলে একটা অদ্ভুত অনুভূতি, শিরশির করে রক্ত গড়িয়ে পড়া, সব মিলিয়ে যেন কেমন সুড়সুড়ি দিচ্ছিল গায়ে, আমি হাসছিলুম। পায়ের কাছে রক্তের ফোঁটা ফোঁটা পড়ে নিকোনো মেজের উপর এক একটা লাল তারার মতো ফুটে উঠছিল—আমি হাসতে হাসতে দেখছিলুম সেই মজার খেলাটা।

গাঁদাপাতা ছেঁচে আঙুল বাঁধতে বাঁধতে পিসিমা বলেছিল, এখন দেখছি লোকে ঠিক কথাই বলে। তুই মানুষ নস্‌—হয় রাক্ষস, নয় ডাকাত।

পিসিমা বোধ হয় ভাবত, ডাকাতরা মানুষ নয়; তারা একেবারে গালপাট্টা বেঁধে, মুখে ভুষো-কালি মেখে, হাতে খাঁড়া নিয়েই মায়ের পেট থেকে জন্মায়।

ব্যথা পেলেই আমি হাসতুম। আমার শরীরটা যেন হাসির তার দিয়ে তৈরি একটা যন্ত্রের মত—ঘা লাগলেই তাতে সুর উঠত। শুধু তাই নয়; কেউ কাঁদলে আমার হাসি পেত, কেউ রাগ করলে আমার হাসি আসত। আমার ভেতরটা এমন হাসি দিয়ে ঠাসা বলেই বোধ হয় শরীরটাও এমন হাস্যকরভাবে তৈরি হয়েছিল।

পাঁচ-ছ বছর যখন বয়স হল, তখন অন্যকেও নিজের মত করে হাসাতে চেষ্টা করেছি আমি। কোত্থেকে একদিন একটা আলপিন কুড়িয়ে পেলুম। নিজের গায়ে সেটা একটুখানি বিঁধিয়ে দিতেই সেই হাসির সুড়সুড়ি। একবিন্দু রক্ত বেরিয়ে এসেছিল, হাসতে হাসতে আমি চেটে নিলুম সেটুকু। সেই প্রথম নিজের রক্তের নোনা স্বাদ পেলুম আমি। সে স্বাদ আশ্চর্য, সারা জীবন সেই আমাকে অপরূপ নেশার খোরাক জুগিয়েছে। আমার মনে হয়, রক্তখেকো বাঘ কখনো নিজের রক্ত খায়নি; যদি খেত, তা হলে সে তারই নেশায় মাতাল হয়ে থাকত, পরের রক্তের পেছনে ছুটত না।

যাই হোক, আলপিনটার কথাই বলি। পাড়ার যে তিন-চারটি ছেলেমেয়ের

সঙ্গে আমি খেলা করতুম, তাদের ভেতর যাকে আমার পরম বন্ধু বলে মনে হত, সেই টুনির উরুতে আগাগোড়া আলপিনটা বসিয়ে দিলুম।

ভেবেছিলুম, টুনি খুব হেসে উঠবে। ভেবেছিলুম, আমাদের খেলাটা দারুণ জমে উঠবে এবার। কিন্তু ফল হল একেবারে উল্টো। কেঁদে চেঁচিয়ে সে হাট বসাল, ছুটে পালাল বাড়ির দিকে।

আমার তখন ছ বছর বয়স, কিন্তু সেজন্যে কেউ আমাকে রেয়াত করল না। আমার চেহারা কুৎসিত, আমার স্বাস্থ্য অসম্ভব ভালো, আমাকে দেখায় দশ বছরের মত। খবর পেয়ে ছুটে এল টুনির দাদা, আমাকে প্রকাণ্ড এক চড় বসিয়ে দিল। ঘুরে আমি মাটিতে পড়ে গেলুম।

যখন উঠে দাঁড়ালুম, তখন দাঁতের গোড়া থেকে গড়িয়ে-আসা রক্তের অদ্ভুত স্বাদে আমার মুখ ভরে গেছে। সেই স্বাদে আমি হি-হি করে হেসে উঠলুম। আমাকে তখন কি রকম দেখাচ্ছিল সে আমি জানি; কাঁচা মাংস ছিঁড়তে ছিঁড়তে সার্কাসের বাঘগুলোর রক্তাক্ত দাঁত আমি তারপরে দেখেছি অনেকবার।

টুনির দাদা কিছুক্ষণ হাঁ করে তাকিয়ে রইল আমার দিকে। তারপর কেমন ভয় পেয়ে পিছু হটতে হটতে বাড়ির দিকে চলে গেল। আশা করেছিলুম, আরও মারবে; কিন্তু আমার হাসি দেখে এমন করে ভয় পেয়ে যাবে, সে আমি ভাবতেই পারি নি।

আর একদিনের কথা বলি।

ছুটির দুপুরবেলায় দেখি, বাবা বিছানায় চিত হয়ে একটা বিড়ি ধরিয়েছে। বিড়িটায় দুটো টান দিতে না দিতেই ঘুমিয়ে পড়ল। তারপর দেখলুম, আঙুলের ফাঁক দিয়ে জ্বলন্ত বিড়িটা পড়ল ঠিক বাবার বুকে গেঞ্জির ওপর। আমার ভারী মজা লাগল। দেখতে লাগলুম, কী হয়।

বেশিক্ষণ গেল না। গেঞ্জিটা পয়সার মত গোল হয়ে পুড়ে উঠতে লাগল। পোড়া লোমের গন্ধ উঠল, তার পরেই 'উরেঃ বাপ রে' বলে বাবা তড়াক করে লাফিয়ে উঠল। আমি তখন হাসিতে ফেটে পড়ছি।

বাবা খড়ম নিয়ে তেড়ে এল, প্রাণ খুলে হাসবার জন্যে তৈরি হলুম আমি। কিন্তু ঠিক সেই সময়ে কোথা থেকে এসে পড়ল পিসিমা। প্রায় ছোঁ মেরে আমাকে তুলে নিয়ে চলে গেল। শুনতে পেলুম, পেছনে বাবা সমানে চিৎকার

করছে ঃ ছেড়ে দে, ছেড়ে দে, ওই পেত্নীর ছানাটাকে আজ আমি খুনই করে ফেলব।

বাবা আমার অনেক নাম দিয়েছিল। এখন মনে হয় সব লিখে রাখতে পারলে বেশ হত। শ্রীকৃষ্ণের শত নামকেও আমি টেক্কা দিয়ে যেতে পারতুম।

সেই বাবারই শেষে একদিন আমার ওপরে চোখ পড়ল।

আলপিন ফোটানোর ব্যাপারের পর থেকে পাড়ার ছেলেমেয়েরা আমার সঙ্গে কিছুদিন খেলাধুলো বন্ধ করে দিয়েছিল। তারপরে আস্তে আস্তে আবার ফিরে এল সবাই। শুধু কথা দিতে হল, আর কারও গায়ে আমি কোনদিন পিন ফোটাতে পারব না।

আমি রাজী হলুম। আর কোন কারণে নয়—ওরা আমাকে খেলায় নেবে না বলে।

কিন্তু ওরাও আমাকে বুঝতে পেরেছিল। ছোটরা বড়দের চাইতে অনেক সহজে বুঝতে পারে, চিনে নিতে পারে মানুষকে। আমাকে খুশী করবার উপায় খুঁজে পেয়েছিল ওরা। নিজেরা ব্যথা পেয়ে নয়, আমাকে ব্যথা দিয়ে।

কয়েকদিন আগে গ্রামের ভেতর দিয়ে হাতি গিয়েছিল একটা। আমাকে ওরা হাতি সাজাল।

ছ বছর বয়সে আমার দশ বছরের শরীর, স্বাস্থ্যও তেমনই। দুজন করে সোয়ারী হল আমার পিঠে। তারপর একটা গাছের ডাল দিয়ে সপাসপ্ করে পিটতে পিটতে বললে, চল্—চল্—

চাবুক পড়ে আর আমি চলি। চাবুকের ঘায়ে কখনও কখনও কালশিরা পড়ে য়ায় পিঠে, পাঁজরায়। আমি হাসতে হাসতে ওদের নিয়ে চলতে থাকি। হাঁটু দুটো ছড়ে যায়, রক্ত নামে, নিজের সর্বাঙ্গকে আমার বেলুনের মত মনে হয়, যেন হাসির গ্যাস দিয়ে ঠাসা।

হাতি হই, ঘোড়াও হতে হয়। তারপর একদিন আমগাছ হতে হল।

ঢিল ছুড়ে সবাই আম পাড়ছে। একটা ঢিল এসে মুখে লাগল, ভেঙে গেল দুটো দাঁত, রক্ত গড়াতে লাগল কষ বেয়ে। সেই রক্ত চাটতে চাটতে আমি হেসে উঠেছি, কিন্তু আমার মুখের দিকে তাকিয়ে দারুণ ভয়ে ওরা যে যেদিকে পারে ছুটে পালাল। (আজ আমি জানি, মানুষ কী অস্বাভাবিক

ভীতু, রক্ত দেখলে কী যে ছেলেমানুষী ভয় হয় তার!) আর সেই সময় বাবা সেখানে এসে হাজির।

কালীপুজো সেরে ফিরছে। এক হাতে নতুন গামছায় মস্ত বড় একটা পুঁটলি, আর এক হাতে একটা পাঁঠার মাথা। মাথাটার নীচে খানিকটা কালো রক্ত জমাট বেঁধে রয়েছে। বাবার নিশ্চয় ভয়ানক খিদে পেয়েছিল, তাই চলছিল খুব তাড়াতাড়ি। আর চোখমুখ লাল। বোধ হয় রোদে হেঁটে আসছিল অনেক দূর থেকে।

আমার দশা দেখে থমকে দাঁড়িয়ে গেল বাবা।

এ কি!

আমরা খেলছিলুম।

এ কি খুনে-খেলা? দাঁত ভেঙে রক্ত পড়ছে, আর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাসছিস তুই!

রক্তমাখা মুখে আবার খানিকটা হেসে বললুম, আমার খুব ভাল লাগছে বাবা।

ভাল লাগছে!—ঠাস ঠাস করে বাবার তিন-চারটে চড় পড়ল আমার পিঠে ঃ তুই মানুষ, না গণ্ডারের ছানা! বাড়ি চল্ শীগগির, চল্ বলছি—

সেই আমার ওপর বাবার চোখ পড়ল।

বাড়ি ফিরে এলে, পিসিমার হাঁউ-মাউ বন্ধ হলে, গরম জল দিয়ে মুখ-টুখ ধোয়া হয়ে গেলে, বাবা বলল, বামুনের ছেলে গোমুখ্যু হয়ে থাকবি, আর সকলের কাছে মারধোর খাবি? তোকে পড়াব আজ থেকে। তারপর হাতে-খড়ি হয়ে গেলে ভর্তি করে দেব ইস্কুলে।

আমার পড়া শুরু হল।

হাসবার সুযোগ পেয়েছিলুম আবার। বাবা কড়া মেজাজের পণ্ডিত, পেটানোতে তার নাম আছে। আমার জন্যেও তার হাতে চড় তৈরি হয়েই ছিল। কিন্তু সে সুযোগ আমি নিতে পারলুম না। একবার দুবারেই আমি অ-আ-ক-খ একেবারে মুখস্থ করে ফেললুম!

বাবা চমৎকৃত! ছেলেটার তো মাথা আছে!

পিসিমা ছুটে এল। বলল, আমি তো তখুনি বলেছিলুম ও সাধারণ ছেলে নয়। ও ক্ষণজন্মা, দশজনের মধ্যে একজন ও হবেই এ তোমরা দেখে নিয়ো।

হ্যাঁ, আমি সাধারণ নই। দশজন নয়, লাখের মধ্যে একজন হওয়ার জন্যেই জন্মেছি। আজ মনে পড়ে, ঠিক সেই সময়, বাড়ির সামনেকার নারকোল গাছটার ওপর বিদ্যুতের মত আলো ছড়িয়ে দিয়ে উল্কা ছুটে গিয়েছিল একটা। যেন আমার জন্মলগ্নের নক্ষত্রটা হা-হা করে একটা নিঃশব্দ হাসিতে তখন আকাশটাকে ধাঁধিয়ে দিয়েছিল।

॥ দুই ॥

আরও বছর খানেক পরে আমি ইস্কুলে ভর্তি হলুম।

ইস্কুল ঠিক আমাদের গ্রামে নয়, পাশের গ্রামে। দুখানা আখের ক্ষেত, একটা পদ্ম দীঘি, তার পাশে ডোমদের পোড়ো ভিটে, তারপর নিম-নিশিন্দেব মজা-খালটার সাঁকো পেরিয়ে তবে বিষ্টু নগর। ইস্কুল সেখানেই। আধ ক্রোশের ওপর রাস্তা।

আমাদের গ্রামের দু-চারটে ছেলে পড়ে সেখানে। বাকী সব অচেনা। সব নতুন মুখ।

তালগাছের মত ঢ্যাঙা হেড মাস্টার, গলাবন্ধ কোট, চোখের চশমা নাকের আধখানা অবধি ঝুলে রয়েছে। এক টিপ নস্যি নাকে দিতে যাচ্ছিলেন, আমার দিকে চোখ পড়তেই হাতটা মাঝপথে থেমে গেল। ঠিক কেমন করে যে তাকিয়ে রইলেন আমি বলতে পারব না। (আজ বলতে পারি। ও-রকম দৃষ্টি লক্ষ লক্ষ মানুষের চোখে আমি দেখেছি তারপর।)

বাবা বলল, আমার ছেলে। মুরারি। মুরারি, প্রণাম কর ওঁকে।

প্রণাম করলুম।

নিজের নামটা বলে ফেলেছি এখানে। কিন্তু বলতে কেমন একটা আশ্চর্য লাগছে। ওরকম একটা নাম যে কোনদিন আমার ছিল, এ যেন বিশ্বাস করতেও ইচ্ছে হয় না। অন্য কারও একটা বেমানান জামার মত নামটা আমাকে বয়ে বেড়াতে হয়েছে কিছুদিন, কখনই ওটা আমার সঙ্গে খাপ খায় নি। নিজের মানানসই নাম ইস্কুলেই খুঁজে পেয়েছিলুম সেদিন।

হেড মাস্টার শুধু বললেন, তা বেশ, বেশ।

ক্লাসে গেলুম। ক্লাসসুদ্ধ ছেলের চোখ ঘুরে আমার উপর এসে পড়ল। পেছন থেকে পরিষ্কার শুনতে পেলুম ঃ এটা কী রে? ভূতের বাচ্চা নাকি?

আর একজন বলল, না থার্ড পণ্ডিতের ছেলে।

যেমন—বাবাকে একটা বিশ্রী গালাগাল দিয়ে বলল, যেমন থার্ড পণ্ডিত, তেমনি তার ছেলে!

সঙ্গে সঙ্গে পিঠে একটা চিমটি পড়ল।

আর তৎক্ষণাৎ আমার শরীরের হাসির যন্ত্রটায় ঝঙ্কার উঠল। হা-হা করে হেসে উঠলুম আমি। তারপর সেই হাসিটাকে আরও ভাল, আরও জমাট করে তোলবার জন্যে পেছন ফিরে একটা দাঁত বের করা ছেলের গালে প্রাণপণে একটা চড় বসিয়ে দিলুম।

আমার ন বছরের গায়ে বারো বছরের বল, হয়তো আরও বেশী। চড় খেয়ে একবার আঁক্ করে উঠল ছেলেটা। অদ্ভুত ভঙ্গিতে হাঁ করল কাঁদবার জন্যে, কিন্তু কাঁদতে আর পারল না। তার আগেই শিবনেত্র হয়ে বেঞ্চি থেকে নীচে গড়িয়ে পড়ল।

ভেবেছিলুম সারা ক্লাসটা হাসিতে ফেটে পড়বে। কিন্তু ফল হল অন্য-রকম। কিছুক্ষণ সবাই হাঁ করে তাকিয়ে রইল। তারপর চার-পাঁচটা ছেলে একসঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়ল আমার ওপর।

আমার হাসির যন্ত্রটায় যেন সেতারের ঝালা চলতে লাগল। হাত-পা সমানে চালাতে লাগলুম আমি। ওদেরও খুব ভাল করে হাসানো দরকার।

কিন্তু কেউ হাসতে পারল না। দুজনের নাক দিয়ে রক্ত পড়ছে। এক-জনের কান গাল ছড়ে একাকার। দুজন ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে শুরু করেছে।

সেই সময় ক্লাসে ঢুকলেন মাস্টার। থমকে দাঁড়ালেন কয়েক সেকেণ্ডের জন্যে। তারপর ঘর-ফাটানো গলায় চিৎকার করে উঠলেন এই উল্লুক শুয়োর-হারামজাদার দল, কী হচ্ছে এসব?

কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ। তারপর—

এই থার্ড পণ্ডিতের ছেলেটা স্যার—

শুধু শুধু আমাদের মারছে স্যার—

আমার নাক ভেঙে দিয়েছে স্যার—

চুপ। মাস্টার চিৎকার করে উঠলেন।

চিৎকারের শেষ দিকটা কেমন কান্নার মত শোনাল। বললেন, যেমন রূপ, গুণও দেখছি তেমনি। চল হেড মাস্টারের কাছে।

তালগাছের মত লম্বা হেড মাস্টার সব শুনে বেঁকে গেলেন টাট্টু ঘোড়ার মত। ডাক ছাড়লেন ঃ রামজয়বাবু!

রামজয় বাবার নাম।

ব্যাপারটা এর মধ্যেই সারা ইস্কুলে রটে গেছে, বাবারও শুনতে বাকি ছিল না। কাঁপতে কাঁপতে ছুটে এল বাবা। কী অদ্ভুত দেখাচ্ছে বাবার মুখটা—চেনাই যায় না। তারপর হেড মাস্টার হাঁ হাঁ করে ওঠবার আগেই বাঘের মত লাফিয়ে পড়ল আমার ওপরে।

আমি হাসতে লাগলুম। পৃথিবীর যেখানে যত হাসি আছে, সব যেন সমুদ্রের ঢেউয়ের মত এসে আছড়ে পড়ল আমার ওপর। আমি দেখছিলুম, দেওয়ালে ঝোলানো মস্তবড় ম্যাপটা হাসির দমকে দুলে দুলে উঠছে, দেওয়াল-ঘড়িটা একরাশ কালোকালো দাঁত বের করে শব্দহীন হাসিতে ভরিয়ে তুলছে চারিদিক, বাবার বিকৃত বীভৎস মুখটা থেকেও যেন হাসির উচ্ছ্বাসে সাদা সাদা ফেনা গড়িয়ে পড়ছে। তারপর পৃথিবীর সমস্ত হাসি আকাশ-ছোঁয়া একটা ঢেউ হয়ে এসে আমাকে টেনে নিয়ে গেল—অন্ধকার থেকে আরও গভীর, আরো কালো অন্ধকারে আমি ডুবে গেলুম।

কখন আমাকে বাড়িতে নিয়ে এসেছিল আমি জানি না। যখন চোখ মেললুম, তখন দেখি, পিসিমা কাঁদছে।

বাপ তো নয়, আদত কসাই! এমন করেও মারে? ছেলে এখন বাঁচলে হয়!

কিন্তু অত সহজেই তো আমার মরলে চলে না। দুদিন পরেই উঠে দাঁড়ালুম আমি। সুস্থ, সবল, স্বাভাবিক। শুধু বাঁ দিকের চোখের ভ্রু থেকে কানের ডগা পর্যন্ত একটা লম্বা কাটা দাগ আমার চেহারাটাকে আরও অপরূপ করে তুলল।

তিন দিন পরে বাবা বললেন, চল্ ইস্কুলে।

পিসিমা চিৎকার করে উঠল। বলল, না, ও-ইস্কুলে আর যেতে হবে না ওকে। সবাই মিলে ছেলেটাকে মেরেই ফেলবে।

বাবা ভেংচি কেটে উঠল ঃ মেরে ফেলবে? কে মারতে পারে ওকে? কিছু ভাবিস নি, দেখবি দিনকয়েক বাদে ও নিজেই খুনের দায়ে ফাঁসিতে ঝুলবে।

পিসিমা বলল, ঝোলে তো ঝুলুক। কিন্তু ইস্কুলে গিয়ে দরকার নেই ওর।

বাবা বলল, নাঃ, দরকার নেই? বামুনের ছেলে, শেষে রাঁধুনি হবে নাকি? তাও যে চেহারা, কোনও ভদ্দরলোকের বাড়িতে ওকে ঢুকতে দেবে না। নে—চল্ আমার সঙ্গে। ফের যদি কোন গণ্ডগোল করবি ইস্কুলে, খুন করে ফেলব একদম। মনে থাকে যেন কথাটা।

আমি ইস্কুলে ফিরে এলুম।

এবার কেউ ঠাট্টা করল না, কেউ টিপ্পনি কাটল না আমাকে। বরং ভয় আর কৌতুহল নিয়ে সবাই আমার দিকে তাকিয়ে রইল। বুঝতে পারলুম, আমার হাসির ধাক্কাটা ওদের পক্ষেও মাত্রা ছাড়িয়ে গেছে। এমন কি, ক্লাস-মাস্টার পর্যন্ত কেমন ভয়ে ভয়ে আমার দিকে চেয়ে দেখলেন।

তিন-চারদিন পর্যন্ত আমাকে কেউ পড়া জিজ্ঞেস করল না, একটা ছেলেও মিশল না আমার সঙ্গে। তারপরে একদিন টিফিনের ঘণ্টায় যে ছেলেটাকে আমি প্রথম চড় মেরেছিলুম সে-ই নিজে থেকে ভাব করতে এল।

তোর বাবা সেদিন তোকে মেরে মেরে অজ্ঞান করে ফেলল, আর তুই হাসছিলি?

আমাকে কেউ মারলে আমার ভীষণ হাসি পায়।

মারলে হাসি পায়!—চড় খেয়ে যেমন হাঁ করে ছিল, তার চাইতেও দ্বিগুণ হাঁ করে রইল ছেলেটা। বলল, তুই মানুষ না আর কিছু?

কী জানি। বাবা আমাকে রাক্ষস বলে।

ছেলেটার নাম আনন্দ। পরে জেনেছিলুম, চার বোনের সে একমাত্র ভাই। ফরসা রোগা চেহারা, মেয়েলি মেয়েলি গড়ন, ভারি শান্ত, ভারি মিষ্টি মুখখানা। পেছন থেকে ও যে আমাকে সেদিন চিমটি কেটেছিল, ওকে দেখে সে-কথা বিশ্বাস করতেই ইচ্ছে হয় না।

আনন্দ বলল, যাঃ, তুই রাক্ষস হতে যাবি কেন? চেহারা কারুর দেখতে খারাপ হলেই কি সে রাক্ষস হবে? আমাদের ড্রিল-মাস্টার বিভূপদবাবুকে দেখতো তো হাতির মত লাগে, তাই বলে সত্যিই হাতি নাকি তিনি?

কথাটা আমি ভাবতে চেষ্টা করলুম।

আনন্দ আবার বলল, কিন্তু ভারি আশ্চর্য তো! কেউ মারলে তোর হাসি পায়? সত্যি বলছিস?

সত্যি বলছি।
লাগে না?
লাগে বইকি।
কষ্ট হয় না?
তা তো জানি না। দারুণ হাসি পায়।
একটু চুপ করে থেকে আনন্দ বলল, তুই ভারি অদ্ভুত।
অদ্ভুত কথাটা শুনে আমার কী একটা মনে হল। আমি বললুম, তুই আমাকে ভূত বলে ডাকিস।
আনন্দ বলল কেন রে?
মুরারি নামটা আমার ভাল লাগে না। কেমন বিশ্রী শোনায় কানে।
আনন্দ বিব্রত হয়ে বলল, তোর সঙ্গে আমি ভাব করে নিয়েছি, তোকে আমি ভূত বলতে পারব না।
তা হলে ভূতো বলিস।
এবারে ও হেসে ফেলল।
আচ্ছা, তাই বলব। কিন্তু ইস্কুলে নয়। তোকে একা পেলে ওই নামে ডাকব।
আনন্দের সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব হয়ে গেল।
অনেক দিন ভেবেছি, আমার কুৎসিত এই বীভৎস চেহারা সত্ত্বেও কেন এমন করে আমার দিকে আকৃষ্ট হয়েছিল আনন্দ। তার চেহারা সুন্দর, স্কুলের সকলের চাইতে সুন্দর। আমাদের দুজনকে একসঙ্গে দেখলে প্রায়ই সেকেণ্ড মাস্টার একটা ইংরেজী কথা বলতেন ঃ বিউটি অ্যাণ্ড দি বীস্ট। সেদিন কথাটার মানে বুঝতে পারি নি, কিন্তু আজ বুঝেছি। বুঝেছি অনেক দাম দিয়ে। আরও বুঝেছি, কেন আনন্দর আমাকে ভাল লেগেছিল।
কিন্তু সে কথা এখন থাক্। পরের কথা পরেই বলব।
ইস্কুলের দিনগুলো কাটতে লাগল এক রকম। আস্তে আস্তে আমিও সকলের চোখে সয়ে গেলুম। কেবল মধ্যে মধ্যে দু একটা নতুন ছেলে এলে আমার দিকে তাকিয়ে আঁতকে উঠত। সঙ্গে সঙ্গে অন্যেরা তাদের সাবধান করে দিত ঃ ওকে ঘাঁটাস নি, ওটা বুনো মোষ।
আর একটা নতুন নাম। আমার সহস্র নামের তালিকায় নতুন আর একটা সংযোজন।

তারপর অনেকদিন আমার আর হাসবার সুযোগ আসে নি—হাসাবারও না। শরীর যেমনই হোক, লেখাপড়ায় আমার মাথা ছিল। পরীক্ষায় আমি থার্ড হলুম। আর বছর দুই কাটল। সেকেণ্ড হলুম দুবার।

শেষের বারে আনন্দ বলল, তুই ফার্স্ট হতিস। সেকেণ্ড মাস্টার তোকে দেখতে পারে না—তাই ইচ্ছে করে তোকে ইতিহাসে অনেক কম নম্বর দিয়েছে।

এই সেকেণ্ড মাস্টার! একটু আশ্চর্য ধরনের লোক। আমার মধ্যে মধ্যে ওঁকে হাসাতে ইচ্ছে করত। ইচ্ছে করত দারুণভাবে।

ইস্কুলে মারকুটে পণ্ডিত বলে যেমন বাবার নামডাক ছিল, তেমনি সেকেণ্ড মাস্টারের নাম ছিল মজার লোক বলে। খুব মজা ভালবাসতেন সেকেণ্ড মাস্টার। দু আঙুলের ভেতরে পেনসিল পুরে চাপ দিতে দিতে আদর করে বলতেন, লাগছে? আহা না-না, বেশী লাগবে কেন? বেশ আরাম বোধ হওয়ারই তো কথা। কি বলিস, অ্যাঁ?

কাউকে বা হাফ-ডাউন করে রেখে তার পিঠে বেশ আদর করে টোকা দিতে দিতে বলতেন, বাঃ, বেশ দেখাচ্ছে। চতুষ্পদ না হলে কি তোমাকে মানায় বাপধন? এইবার একটি ল্যাজ বেরুলেই আর কিছুটি বলবার থাকে না।

কেবল আমাকে একটু রেয়াৎ করতেন। আমি পড়া না পারলেও হাত তুলতেন না, অর্থাৎ পেনসিলের চাপ বা হাফ-ডাউনের ব্যবস্থা করতে পারতেন না। তখন আমার বয়স চৌদ্দ—কুড়ি বছরের মত জোর আমার গায়ে। অত বড় ভারী ব্ল্যাকবোর্ডটাকে ঘরের এ-কোণ থেকে ও-কোণে আমি টেনে নিতে পারি। আমার চেহারা, আমার গায়ের জোর—আর, আর হয়তো আমার হাসির ভয়েই আমাকে এড়িয়ে চলতেন সেকেণ্ড মাস্টার।

শুধু একদিন সামলে নিয়েছিলেন একটুর জন্যে

ইস্কুলে আসবার পথে বৃষ্টি এল। বাবার আগেই সেদিন বেরিয়ে পড়েছিলুম—বাবার সঙ্গে আসতে আমার ভাল লাগে না। একা আসছিলুম, ছাতা ছিল না।

আখ ক্ষেত পেরুতে ঝেঁকে বৃষ্টি। দাঁড়াবার জায়গা পাই না। শেষে ডোমদের একটা পোড়ো চালার নীচে দাঁড়ালুম। বৃষ্টি পুরোপুরি আটকাচ্ছিল না। চুঁইয়ে চুঁইয়ে দু-চার ফোঁটা পড়ছিল গায়ে মাথায়। তারপর বৃষ্টি ধরলে যখন ইস্কুলের ক্লাসে ঢুকেছি, তখন সেকেণ্ড

মাস্টার পড়াতে শুরু করেছেন। আমাকে দেখেই কেমন করে যেন তাকালেন।

আমি টের পাই নি, উপর থেকে ঝুল-গলানো জলের কালো কালো দাগ আমার গায়ে মুখে পড়েছিল।

একবারের জন্যে চোখ পিটপিট করে উঠল সেকেণ্ড মাস্টারের। বললেন, বাইরে দাঁড়িয়ে কেন বৎস? ভেতরে এস।

আমি ভেতরে ঢুকতেই আবার জিজ্ঞেস করলেন, তোমাকে তো ঠিক চিনতে পারছি না। কোন্ গাছ থেকে নেমে এলে?

ফস করে বলে ফেললুম, আপনার গাছটার পাশের গাছ থেকে স্যার।

ওই বয়সে কথাটা আমার মুখে কে জুগিয়ে দিল জানি না। কিন্তু সেকেণ্ড মাস্টারের মুখের রঙ একবার লাল হল, একবার কালো হল, আবার লাল হল, তারপরে আবার কালো হয়ে গেল। একটু চুপ করে থেকে বলল, নিজের জায়গায় বসে থাক্ গে, যা।

সেদিন আর ক্লাসটা তাঁর জমল না। কেমন ভাঙা গলায় পড়িয়ে গেলেন।

একদিন আনন্দ বললে, যাবি আমাদের বাড়িতে?

ইস্কুলের ছুটির পরে দু'জনে আসছিলুম মাঠের রাস্তা দিয়ে। একসঙ্গে রোজ আমরা প্রায় আধ মাইল পর্যন্ত আসি, তারপর একপাশে রাংচিতের বেড়া, আর একপাশে একটা মজাপুকুরের মাঝখানটি দিয়ে যে ছোট রাস্তাটি চলে গেছে—তা দিয়ে ডান দিকে কোথায় চলে যায় আনন্দ—আমি সোজা পথ ধরে হাঁটতে থাকি।

আজও ঠিক সেইখানটিতে এসে আনন্দ আমাকে বললে, যাবি আমাদেব বাড়িতে?

মজাপুকুরের পানার উপর হেঁটে হেঁটে একজোড়া জলপিপি কী যেন খুঁটে খুঁটে খাচ্ছিল তখন। পুকুরের ওপারে আলোক-লতায় ছাওয়া কুল গাছে বিকেলের সোনাঝুরি রোদ পড়েছিল—যেন সোনার জাল জড়িয়ে কোনো রূপ-কথার বুড়ী জ্বরের ঘোরে রোদ পোয়াচ্ছিল। রাংচিতার বেড়ার গায়ে গাঢ় হলুদ রঙের একটা প্রজাপতি উড়ছিল—ঠিক মনে হচ্ছিল দুটো শেয়াকুলকাঁটা ফুলের পাপড়ি হাওয়ায় উড়ছে। আনন্দর মুখখানা ভারী নরম, ভারী কোমল দেখাল তখন।

—চল্ না।

—কিন্তু দেরি হয়ে গেলে বাবা মারবে।

—দেরি হবে কেন? এই একটু এগোলেই তো আমাদের বাড়ি। আয়।

কুল্‌কুল করে মিষ্টি গলায় একটা পাখি ডাকল। একটা জলপিপি পাখা ঝাড়ল—কে জানত ওদের ডানার ভিতর লুকিয়ে আছে রামধনুর মতো রঙ। ঘন হলুদ পাপড়ির পাখনা দুটো মেলে প্রজাপতিটা ঘুরতে লাগল আনন্দর মাথার উপরে। বললুম, চল্।

পায়ে চলা ছোট্ট রাস্তাটি দিয়ে, কাদের একটা মস্ত গোলাবাড়ি পার হয়ে, আনন্দের বাড়িতে এসে পৌঁছলুম।

সামনে দুটো শ্বেত করবীর গাছ ফুলে ফুলে শাদা। টিনের চাল, মাটির দেওয়ালের ছোট বাড়িটি।

আনন্দর বাবা কোন্ জমিদারের তশীলদারী করেন মহালে বেরিয়েছেন। এলেন আনন্দর মা। যেমন ফর্সা, তেমনি রোগা। আর এল ওর দুটি বোন—একজন বছর পাঁচেক, আর একজন বছর সাতেকের হবে।

আমাকে দেখে মেয়ে দুটো কিছুক্ষণ অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল। তারপর খিলখিল করে হাসি।

আমি জানি, আমাকে প্রথম দেখলে সকলেরই অমনি হাসি পায়। কিন্তু আমার রাগ হয় না বরং একটা চাপা অহংকার জাগে মনে মনে। সেই বয়েসেই জেনেছিলুম, আমি অসাধারণ। আমার বয়েসী কত ছেলেই তো আছে সংসারে-কিন্তু এমন করে সকলকে হাসানোর শক্তি আমি ছাড়া আর কার আছে?

আনন্দর মা বোধ হয় মেয়েদের ধম্‌কে দিতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু তার আগেই আমি হেসে উঠলুম। বললুম, আমি ভূত। তোমাদের ভয় দেখাতে এসেছি!

মেয়ে দুটোর হাসি বন্ধ হয়ে গেল। ছোটটা চোখ বড়ো বড়ো করে তাকিয়ে থেকে বললে, সত্যি?

আমি বললুম, না—আমি ভালুক। তোমাদের ধরে ধরে খাবো।

ওরা হেসে ফেলল আবার। ছোট মেয়েটা বললে, দুৎ, মানুষ। মিথ্যে কথা বলছে।

আনন্দর মা আমার মাথায় হাত রাখলেন। তারপর পিসিমা যেমন করে—

তেমনিভাবে আমার চুলে আঙুল বুলিয়ে দিয়ে বললে, মানুষ বইকি—খুব ভাল ছেলে। তুমি তো মুরারি—তাই না?

আমি অবাক হয়ে তাকালুম ঃ আপনি কী করে জানলেন?

—আমি সব জানি। এসো ভেতরে।

আনন্দের মা আমার হাত ধরে বাড়ীর মধ্যে নিয়ে গেলেন। ভাবলুম, আমার যদি মা থাকত, সেও কি এমনি করে আমার হাত ধরত—এত নরম লাগত তারও ছোঁয়া?

না। আমার মা অন্যরকম ছিল। সে কাউকে ভালবাসত না, কেউ তাকে কখনো ভালবাসেনি।

আনন্দদের দাওয়ায় বসে মুড়ি, পাটালীগুড় আর নারকেল-কোরা খেতে খেতে ওর বোন দুটির সঙ্গেও আমার ভাব হয়ে গেল। বড়টির নাম টুন্‌কি, ছোটর নাম ঝুন্‌কি।

গল্প করতে খুব ভালবাসে টুন্‌কি।

—জানো, আমাদের দু'জন দিদি আছে—তাদের বিয়ে হয়ে গেছে। আমরা চার বোন আর মোটে এক ভাই কিনা—তাই দাদাকে সবাই খুব ভালবাসে। বাবা-মা দাদাকে কখনো মারে না।

ঝুন্‌কি জিজ্ঞেস করলে, তোমার বোন নেই?

আমার মুড়ি চিবনো বন্ধ হয়ে গেল বুকের ভিতরটা কেমন করে উঠল যেন। আমারও যদি এমনি দুটি ফুট্‌ফুটে ছোট বোন থাকত বেশ হত তা হলে।

বললুম না, আমার ভাইবোন কেউ নেই।

ঝুন্‌কি হাততালি দিয়ে উঠল।

—তবে তো তোমার আরো মজা। মা-র সব আদর বুঝি তুমি একাই পাও?

বললুম, আমার মা-ও নেই। কেবল পিসিমা আছে।

মা নেই! ওদের তিনজোড়া চোখ ছলছল করে উঠল। এবারে আমার হেসে উঠতে ইচ্ছে করল। সব মা তো ওদের মা-র মতো নয়। সবাই-ই তো বলে, খুব কুঁড়ে আর ঝগড়াটে ছিল আমার মা। যদি বেঁচে থাকত, রাতদিন হয়তো মারধোর করত আমাকে—আর যন্ত্রণায় হা-হা করে হাসতে হাসতে আমার মনে হত, আমি দু হাতে মা-টার গলাটা টিপে ধরি।

ওরা তিনজনেই কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। হয়তো ভাবল, মা-র কথা মনে পড়িয়ে দিয়ে খুব কষ্ট দিয়েছে আমার মনে। হঠাৎ উঠে ছুটে গেল টুনকি, বললে, দাঁড়াও মুরারিদা—একটা খুব মজার জিনিস দেখাচ্ছি তোমাকে।

মজার জিনিস? আমি মনে মনে ভাবতে চেষ্টা করলুম। এখুনি হয়তো একটা বেলকাঁটা এনে ফুটিয়ে দেবে আমার গায়ে, নইলে কয়েকটা বিষপিঁপড়ে এনে ছড়িয়ে দেবে পিঠের উপর, আর শরীরে যন্ত্রণা যত বেশি চমকে চমকে উঠবে, ততই আমি হাসিতে উছলে উঠব।

তারই জন্যে আমি তৈরি হচ্ছিলুম, কিন্তু সে-সব কিছুই ঘটল না। কোত্থেকে একরাশ ছবি এনে টুনকি আমার সামনে ফেলে দিলে। বললে, দেখো।

আনন্দ লজ্জায় রাঙা হল, রাগ করল তারপরে।

টুনকি, মারব তোকে এক চড়। কেন নিয়ে এলি এ-সব? ও দেখতে হবে না মুরারি- রেখে দে।

বুঝতে পারলুম, আনন্দ এঁকেছে এইসব। যেমন খুশি হলুম, তেমনি অবাক লাগল।

রাখব কেন? দেখি না।

কী সুন্দর সুন্দর ছবি—কী তার রঙ! নারকেল গাছের মাথার উপর দিয়ে চাঁদ উঠছে; দুটো শালিক পাখি বসে আছে পাশে পাশে—একটা আর একটার গা খুঁটে খুঁটে দিচ্ছে; নদী দিয়ে চলেছে পালতোলা নৌকো; পাকা আম এঁকেছে, লিচু এঁকেছে—আর কতরকম ফুল যে এঁকেছে! কী সুন্দর--কী আশ্চর্য!

সত্যি? সব তোরই আঁকা?

আনন্দ জবাব দিল না। মাথা নামিয়ে বসে রইল চুপ করে।

—এমন সব রঙ কোথায় পেলি?

-রঙ আবার কোথায় পাবে? জবা ফুল, ঘাসপাতার রস, কালি, শিউলি ফুলের বোঁটা—এইসব দিয়েই তো দাদা ছবি আঁকে।

আমি ওই ছবিগুলোর দিকে তাকিয়ে রইলুম। মার খেলে চিরদিন আমার হাসি পায়, আজ এই ছবিগুলোর দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে কেন জানি না—বুকের মধ্যে কী যেন দুলে দুলে উঠতে লাগল। মনে হল, আমার কান্না পাচ্ছে। আনন্দর ওই খুব ফর্সা আর খুব রোগা মা, এই টুনকি-ঝুনকি—

এই ছবিগুলো এরা সবাই মিলে কী যেন ঘটিয়ে দিচ্ছে আমার ভিতর। আমার জীবনে এমন কখনো ঘটেনি—কোনোদিনই না।

আমি বললুম, ভাই আনন্দ, এবার আমি যাই। সন্ধ্যে হয়ে যাবে এর পর।

—এখুনি যাবি কেন? এই তো এলি।

—না, যাই আজ। পিসিমা ভাববে।

আমি বসতে পারছিলুম না। একটা অদ্ভুত কষ্ট হচ্ছে কোথাও। অথচ তাতে এতটুকুও হাসি পায় না—কেমন মনে হয়, এখুনি আমার দু চোখ ভরে কান্না নেমে আসবে।

সেই দুটো ফুলে ফুলে ভরা কাঞ্চন গাছের ভিতর দিয়ে বেরিয়ে এসে, যখন রাংচিতার বেড়া আর পুকুরটার কাছে এসে পড়লুম, তখন রোদের সোনালি রঙ রাঙা। জলপিপি দুটো তখনো খাবার খুঁজছে, তখন একটা নয়—অনেক পাখির ডাকে ভরে গেছে আকাশ, আরো অনেক প্রজাপতি এসে জড়ো হয়েছে; রোদ-পোয়ানো বুড়ীর মতো কুলগাছটার গায়ে আলোক-লতার জালটাকে পুরোনো নামাবলীর মতো মনে হচ্ছে।

আমার মনে হল, এই পথ দিয়ে যায় বলেই তো অমন করে পাখি আঁকতে পারে আনন্দ; ওই কাঞ্চন ফুলের গাছ দুটো আছে বলেই তো অমন ভাবে ফুল ফোটাতে পারে কাগজের উপর; ওই মা—ওই টুনটুকি-বুলবুকি-ওরাই তো আগে ওর চোখে রঙ মাখিয়ে দেয়—শিউলি ফুলের বোঁটা, সবুজ ঘাস—সবাই তখন ওর হাতে ছবি হয়ে আসে।

আর আমাদের বাড়ির সামনে একটা বাজে-পোড়া তাল গাছ; পুরোনো বট যেটা আছে তার কাছাকাছি যাওয়া আমাদের বারণ—ওটার কোটরে নাকি গোখ্‌রো সাপের বাসা। সেই বটগাছটার ঝাঁকড়া মাথার উপর নিথর রাতে শকুনের বাচ্চারা কাঁদে—আমি চম্‌কে জেগে উঠি, পিসিমা আমাকে টেনে নেয় বুকের ভিতর।

আমার মা নেই। বেঁচে থাকলেই বা কী হত কে জানে? পিসিমার দুটো চোখের ভিতর কী যেন থমকে আছে একরাশ অন্ধকারের মতো। ভয়। ভয় ছাড়া আর কিছুই নয়।

আমি কখনো ছবি আঁকতে পারব না আনন্দের মতো। আমি অন্য গ্রামের, অন্য দেশের মানুষ! কিন্তু আমার কি আনন্দর মতো দুটি বোন থাকতে পারত না? পিসিমা কি একটুখানি আনন্দর মা হয়ে যেতে পারত না?

তা হলে আমি তো শুধু হাসতেই পারতুম না—কখন আমার হাসির সঙ্গে কান্না এসে মিশে যেত!

আর ভাবতে পারলুম না। জোরে জোরে পা চালিয়ে দিলুম। দূরে বটগাছটার কালো মাথাটা মেঘের মতো উঁচু হয়ে উঠেছে—যার উপরে নিথর রাত্রে শকুনের ছানা ডুকরে ডুকরে কাঁদে, যার কোটরে কোটরে গোখ্‌রো সাপের বাসা।

এখানকার আমি কেউ নই। ও ই আমার গ্রাম।

সেই কাণ্ডটা হল মাস কয়েক পরে।

বাবা মারধোর করত, ছেলেরা ভয় করত তাকে। কিন্তু সেকেণ্ড মাস্টারকে তারা ভয় করত না, অন্য চোখ দিয়ে দেখত। আজ বুঝতে পারি, ঘৃণা করত। ওই বয়সেও ভেতরে ভেতরে তাদের অসহ্য হয়ে উঠেছিল।

আমি কিছু জানতুম না। কারা যে আগে থেকে সব বন্দোবস্ত করে রেখেছে টেরও পাই নি। ঘণ্টা পড়েছে, সবাই এসে চুপটি করে বসেছে নিজের জায়গায়। তারপর সেকেণ্ড মাস্টার এসে বসলেন চেয়ারে।

কিন্তু বসবার সঙ্গে সঙ্গেই চেয়ারটা গাড়ির মত চলতে আরম্ভ করল। সেকেণ্ড মাস্টার সামলে উঠে পড়বার আগেই উল্‌টে পড়ল চেয়ার। ধপাস্‌ করে মাটিতে পড়লেন সেকেণ্ড মাস্টার, আর চারটে মারবেল ছিটকে গেল চারদিকে।

আধ মিনিটের মধ্যে প্রলয় হয়ে গেল।

কয়েকটা ছেলে ভয়ে কাঠ হয়ে গেছে, বাকীগুলো হাসি চাপবার মিথ্যে চেষ্টা করছে। কিন্তু আমি পারলুম না। হা-হা করে হেসে উঠলুম—হাসির বেগ আর আমার থামতে চায় না।

থর থর করে কাঁপতে কাঁপতে উঠে দাঁড়ালেন সেকেণ্ড মাস্টার। চোখ দুটো আগুনের মত লাল। আলুথালু জামাকাপড়, একপাটি জুতো খুলে পড়েছে পা থেকে। দাঁতে দাঁত ঘষে বললেন, আমার সঙ্গে ঠাট্টা—অ্যাঁ, আমার সঙ্গে—

যিনি সকলকে নিয়ে ঠাট্টা করতে ভালবাসেন, আশ্চর্য, তাঁর নিজের এটুকু সইল না।

কিছুক্ষণ লাল চোখ দুটো তাঁর চরকির মত ঘুরতে লাগল ক্লাসময়।

যারা মুখ চেপে হাসছিল, ভয়ে তারাও থমকে গেল। শুধু আমিই কিছুতে হাসিটাকে রুখতে পারলুম না। একটার পর একটা ধাক্কার মত আমার পেটের ভেতর থেকে ঠেলে বেরিয়ে আসতে লাগল।

সেকেণ্ড মাস্টার সোজা ছুটে এলেন আমার দিকে।

বেত নিয়ে ক্লাসে আসেন না, তাই কিল-চড়-ঘুষি আমার উপরে বৃষ্টির মত পড়তে লাগল। কড়মড় করে হাড় চিবুনোর মত আওয়াজ উঠতে লাগল দাঁত থেকে।

খুন করব, খুনই করে ফেলব তোকে আজ। এসব তোরই কারসাজি। যেমন তোর শয়তানের মত চেহারা, তেমনি শয়তানের মত স্বভাব। পাজী, উল্লুক, গাধা, বদমাশ, তোকে শেষ না করে আমি ছাড়ব না।

আজও আমি হেসে চলেছি, আমার হাসির যন্ত্রে হিংস্র ঝঙ্কার বেজে চলেছে। সেকেণ্ড মাস্টারের মুখটাকে বুনো শুয়োরের মত দেখাচ্ছে। এত-দিন লক্ষ্যই করি নি, ওঁর দু দিকের দাঁত দুটো অত বড় বড়।

টের পাচ্ছি আমার মুখ রক্তের স্বাদে ভরে গেছে, সেই আশ্চর্য অপরূপ স্বাদ, যার মত নেশা পৃথিবীর আর কোনও জিনিস যোগাতে পারে না। মাথার ভেতরটা ঝিমঝিম করে উঠছে, একটু পরেই আমি সেই অতল গভীর সমুদ্রের মধ্যে ডুবে যাব।

একটু—আর একটু—

আর সেই সময় দাঁড়িয়ে উঠল আনন্দ। চার বোনের এক ভাই। মেয়েলি, মিষ্টি ছেলে আনন্দ।

তীক্ষ্ম সরু গলায় আনন্দ চেঁচিয়ে উঠল, শুধু শুধু ওকে মারছেন স্যার, ওর কোনও দোষ নেই, ও কিছু করে নি। ওকে মারবেন না স্যার, মারবেন না—

মারব না?

সেকেণ্ড মাস্টার এক পলকের জন্যে থামলেন। চোখ দুটো থেকে যেন রক্ত ছুটে বেরুচ্ছে, ঝকঝক করছে ধারালো বড় বড় দাঁত দুটো। তারপর বিকট বীভৎস আওয়াজ করলেন একটা।

বটে, মারব না? চোরের সাক্ষী গাঁটকাটা? তা হলে তোকেই—

আমি হাসছিলুম, কেন জানি না আমার হাসি বন্ধ হয়ে গেল। চার বোনের এক ভাই আনন্দ, ওর বাবা পর্যন্ত কোনদিন ওর গায়ে হাত দেয় নি।

ভীরু, কোমল, নরম মানুষ আনন্দ। আমি তো জানি, শিউলি ফুলের বোঁটা লাল-নীল-কালি আর কাঁচা হলুদ ঘষে ও কী সুন্দর ছবি আঁকে। কত পাখি, কত ফুল! হঠাৎ আমার মনে হল, এখানে আর হাসি চলে না। কিছুতেই সহ্য করা চলে না। সেকেণ্ড মাস্টার আনন্দর গায়ে হাত তুলবে! সেকেণ্ড মাস্টার! আমি দেখলুম, ও যেন আনন্দকে মারছে না—আনন্দর ছবিগুলোকে তুলে নিয়ে কুচিকুচি করে ছিঁড়ে ফেলছে।

সেকেণ্ড মাস্টার এক হাতে আনন্দর চুল মুঠো করে ধরেছেন তখন। হঠাৎ আমি লাফিয়ে উঠলুম হাই বেঞ্চির ওপর। তারপর সেকেণ্ড মাস্টারের চড়টা আনন্দের গালে পড়বার আগেই আমি তাঁর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লুম।

আর একবার উল্টে পড়লেন সেকেণ্ড মাস্টার টেবিলের সঙ্গে ঠুকে গেল মাথাটা। আর সঙ্গে সঙ্গে আমার বন্ধ হাসিটা আবার ছুটে বেরিয়ে এল। সেই অবস্থাতেই সেকেণ্ড মাস্টারের মুখে আমি কয়েকটা ঘুষি বসিয়ে দিলুম। হাসতে হাসতে বললুম মজা লাগছে স্যার, বেশ ভাল লাগছে?

উত্তরে সেকেণ্ড মাস্টারের গলা দিয়ে শুধু গো গোঁ করে খানিক আওয়াজ বেরিয়ে এল।

পেছন থেকে কে যেন চিৎকার করে উঠল, পালা, মুরারি পালা, এখুনি হেড মাস্টার এসে পড়বে--

আমি এক লাফে পালালুম ক্লাস থেকে। দরজা দিয়ে নয়, পেছনের খোলা জানলা দিয়ে। তারপর খেলার মাঠ পার হলুম। পার হয়ে গেলুম চৌধুরীদের ঠাকুরবাড়ি, পেরিয়ে গেলুম ফসল-কাটা ধানের ক্ষেত, তারপর সোজা গঙ্গার খালের ধারে একটা জঙ্গলের মধ্যে ঢুকে পড়লুম। আমাকে দেখেই একটা শেয়াল ঝোপের মধ্যে লুকিয়ে পড়ল।

বসে পড়লুম গাছের একটা মড়া গুঁড়ির ওপর। তলায় স্যাঁতসেঁতে ভিজে মাটি বর্ষার সময় এখানে গঙ্গার জল উঠে আসে।

সামনে খানিকটা বুনো ওলের ঝোপ। ডোরাকাটা সাপের মত তাদের ডাঁটাগুলো, তারই পাশে পড়ে আছে একটা মড়ার মাথা, কালচে সবুজ শ্যাওলা বসেছে তাতে। হাওয়া বইছে অল্প অল্প, বাবলার হলদে ফুল ঝরছে চারপাশে। মাথার ওপর পিঠুলি গাছে ডানা মুড়ে পাশাপাশি বসে আছে দুটো শঙ্খচিল, বাতাসে অসংখ্য বাঁদরলাঠি দুলছে।

বসে বসে হাঁপাতে লাগলুম আমি।

কেন পালিয়ে এলুম? মারবে বলে? না, মারকে আমার ভয় নেই। আমার ভয় শুধু সেই অন্ধকারটাকে—যার মধ্যে আমি ক্রমাগত ডুবতে থাকি; ডুবতেই থাকি—যার ভেতরে কোথাও তলা খুঁজে পাওয়া যায় না।

সেই বয়সেই আমি বুঝতে পেরেছিলুম ও যেন মৃত্যুর মহড়া। জন্মাবার পর থেকে সবাই আমার মৃত্যু চেয়েছিল, তাই আমি বেঁচে থাকতে চাই, তাই যেমন করে হোক আমাকে বাঁচতেই হবে।

বাড়ি ফিরে গেলে বাবা কি ভাবে আমাকে অভ্যর্থনা করবে সে আমি জানি। না, আমি ওতে রাজী নই। হাসতে আমার আপত্তি নেই, মানুষ যাকে যন্ত্রণা বলে ভাবে, আমার কাছে তা একটা অপরূপ অনুভূতি, একটা অদ্ভুত উত্তেজনা। কিন্তু অনুভূতির সেই উচ্ছ্বাসটা যখন চড়া পর্দায় উঠে শূন্যতার মধ্যে ভেঙে-চুরে একাকার হয়ে যায়, তখন সেটা আমি কিছুতেই সহ্য করতে পারি না।

সেই বয়সে কি এত কথা নিজের সম্পর্কে আমি ভেবেছি? না। কিন্তু অস্পষ্টভাবে এমনি একটা চেতনা নিশ্চয়ই আমার মধ্যে ছিল, আজ যেটাকে কথা দিয়ে বুদ্ধি দিয়ে বুঝতে পারি, বোঝাতে পারি, সেদিন যেন জৈব সংস্কারের ভেতর দিয়েই আমি তাকে বুঝতে পেরেছিলুম।

না। বাড়ি আর ফেরা চলে না।

গাছের গুঁড়ি থেকে উঠে আমি সেখানে চলে এলুম, সেখানে এক মুঠো সবুজ ঘাস উঠেছে, দুটো একটা ভুঁইচাঁপা উঁকি দিয়েছে এখানে ওখানে। সারা শরীর ক্লান্তিতে আর দুশ্চিন্তায় এলিয়ে এসেছিল। হাতের উপর মাথা রেখে সেই অনিশ্চিত দুর্ভাবনার মধ্যেও আমি নির্ভাবনার ঘুমে তলিয়ে গেলুম।

জেগে উঠলুম শেয়ালের ডাকে।

চারদিকে কালো নিথর অন্ধকার, হঠাৎ মনে হল, আমি কি মরে গেছি? যে-মৃত্যুর কাছ থেকে প্রতিমুহূর্তে আমি প্রাণপণে বাঁচতে চাই, আমি কি ডুবে গেছি তারই ভেতরে? (না, সে বয়সে এত সব কথা আমার মনে হয় নি। শুধু অনুভবটা ছিল, এতদিন পরে তাকে আমি ব্যাখ্যা করতে পারি।)

চোখের সামনে দেখলুম এক ঝাঁক জোনাকি উড়ছে ঝোপে ঝাড়ে, আবছা-

ভাবে যেন বুঝতে পারলুম, তাদের কয়েকটা সেই মড়ার মাথাটার উপর গিয়ে বসেছে, যেন ওই মাথাটাতে অসংখ্য চোখ জ্বলে উঠেছে।

ঝিঁঝির ডাকে ঝাঁ ঝাঁ করে উঠল মাথার ভেতরটা। তাকিয়ে থাকতে থাকতে মনে হল, জোনাকির বিন্দুজ্বলা মড়ার মাথাটা যেন একটু একটু করে উঠে আসছে মাটি থেকে, একটু পরেই সমস্ত শরীরটা নিয়ে সে উঠে দাঁড়াবে।

একটা তীব্র চিৎকার এসে গলার শিরাগুলোয় থরথর করে কাঁপতে লাগল। চেঁচিয়ে উঠতে পারলে ভয় হয়তো অনেকখানি ভেঙে যেত, কিন্তু আমি চেঁচাতে পারলুম না। ছুটে বেরিয়ে এলুম জঙ্গল থেকে। তাকিয়ে দেখলুম, পেছনে পেছনে জোনাকির ঝাঁকগুলো যেন আমাকেই তাড়া করে আসছে।

আমি আর হাসতে পারছি না। কিন্তু জঙ্গলে শেয়াল ডাকছে। যে অন্ধকারকে আমি ভয় করি, সেই অন্ধকারের হাসির মত তাদের ডাক ছড়িয়ে পড়ছে চারদিকে।

পুবের দিকে কয়েকটা আলো মিটমিট করছিল।

জানি ওইদিকেই রেলের স্টেশন।

॥ তিন ॥

মহবুব মিঞা ভাঙা ভাঙা বাংলায় বলল, এইখানে থাকবি বাচ্চা। এই লেড়কাদের সঙ্গে। যো যো কাম শিখলিয়ে দিব, ওদের সাথ্ মিলেমিশে তাই করবি। লেকিন, ভাগবার চেষ্টা করবি তো মেরে হাড্ডি চুর-চুর করে দেব।

সংক্ষেপে যা বলবার বলে মহবুব মিঞা চলে গেল।

আমি তাকিয়ে দেখলুম চারদিকে। একতলার ছোট ঘর একখানা। মাথার ওপর এই দিনের বেলাতেও মিটমিট করে লালচে একটা আলো জ্বলছে।

ঘরে কয়েকটা ছোট ছোট বিছানা গোটানো। দেওয়ালে এলোমেলো লাল সাদা দাগ। পরে জেনেছিলুম, কিছু পান খাওয়া চুনের, কিছু ছারপোকার রক্তের। তা ছাড়া রঙবেরঙের অসংখ্য ছবি আঠা দিয়ে সাঁটা। সব মেয়ের ছবি। মেঝেতে বিড়ির টুকরো আর ছাই ছড়িয়ে আছে।

আমি কিছু বলবার আগেই ঘরের লোকেরা আমাকে অভ্যর্থনা করল।

তিন চারটি ছেলে। বয়েস বারো থেকে ষোলর ভেতরে। পরনে ময়লা ময়লা পাজামা, কারও গায়ে গেঞ্জী, কারও ছেঁড়া শার্ট। দুজন এক কোণায় বসে ফিসফিস করে কী বলছে, একজন একটা ভাঙা চেয়ারে বসে বিড়ি টানছে—তার মাথায় আবার একটা কালো রঙের টুপি। আর একজন চিত হয়ে একটা গোটানো বিছানা মাথায় দিয়ে অঘোরে ঘুমুচ্ছে।

চেয়ারে বসে যে বিড়ি খাচ্ছিল সে হঠাৎ তড়াক করে নেমে এল আমার দিকে।

এই বে, কি নাম তোর?

বললুম জলিল।

দূর বে, ও তো মহবুব মিঞার দেওয়া নাম। আদত নাম কি তাই বল্।

আমি জবাব দিলুম না। মহবুব মিঞা বলতে আমাকে বারণ করে দিয়েছিল।

ছেলেটা আমাকে যাচ্ছেতাই একটা গাল দিয়ে বলল ঘর-দুয়োর কিছু ছিল না? এখানে মরতে এলি?

ঘর-দুয়োর!

অনেকক্ষণ পরে যেন আমার ঘোর কেটে গেল। একটা নেশার মধ্য দিয়ে চলেছিলুম, এইবার চমকে জেগে উঠলুম।

মাথার ওপর সেই লালচে আলোটার দিকে তাকিয়ে মনে পড়তে লাগল, আমাদের বাড়িতে লণ্ঠনের আলোর রঙও ঠিক ওই রকম। প্রত্যেকদিন সন্ধ্যে-বেলা পিসিমা তিনটে করে লণ্ঠন জ্বালায়, তারই একটা হাতে নিয়ে বাবা পড়াতে যায় সেক্রেটারির বাড়িতে—সেই আখের ক্ষেত আর পদ্মদীঘি পার হয়ে এক মাইল দূরের ভিনগ্রামে।

মনে পড়ল আনন্দর চিৎকার ঃ ওকে মারবেন না স্যার ও কোন দোষ করে নি। তারপর সেই জঙ্গল সেই অন্ধকার, সেই মড়ার মাথাটার উপরে জোনাকির ঝিলিমিলি। সেখান থেকে ছুটতে ছুটতে স্টেশনের নীল আলো। বড় বড় বস্তায় ভরা একটা আধা-অন্ধকার টিনের চালা। তারই ভেতর বস্তার পাশে লুকিয়ে বসে থাকা। শেষে চারদিকে ঝড় তুলে রেলগাড়ি এল। পিসিমার সঙ্গে একবার তারেকশ্বর গিয়েছিলুম, রেল আমি চিনি। টুক করে চেপে বসলুম।

কলকাতা। সবাই বলছিল, কলকাতা। একটা মস্ত ঘরের মধ্যে এসে রেলটা থমকে থেমে গেল।

সব লোক নামছে, আমিও নেমে পড়লুম। সবাই যেদিকে চলেছে, সেই দিকেই এগিয়ে চললুম। তারপর লোহার দরজার মুখ দিয়ে যেখানে একটি-একটি করে লোক বেরুচ্ছে সেখানে কালো কোট-পরা কে একজন খপ করে আমার হাত চেপে ধরল।

টিকিট?

নেই।

আমি জানতুম, রেলে চাপলে টিকিট কাটতে হয়।

আমার হাত চেপে ধরে কালো কোট-পরা লোকটা বলল, টিকিট নেই কি না পরে দেখছি। দাঁড়িয়ে থাক এখানে।

পাশ থেকে আর একজন কালো কোট বলল, ছেলেটার চেহারা দেখেছ ঘোষ? বাপ্‌রে—কী ভয়ানক!

ঘোষ বলল হ্যাঁ, এরাই হচ্ছে আসল ক্রিমিন্যাল। ট্রেনে চুরি-ছ্যাঁচড়ামো করে। পুলিসে দেব।

ক্রিমিন্যাল! হ্যাঁ। কথাটা আমার মনে ছিল। আমার স্মৃতিশক্তি যে ভাল সে পরিচয় বাবা পেয়েছিল, ইস্কুলের সেকেণ্ড মাস্টারও পেয়েছিল। তা ছাড়া সেই বয়েসে, সেই সব দিনের প্রত্যেকটি খুঁটিনাটি পর্যন্ত আমি মনে করতে পারি। জীবনের অনেক ছোট ছোট জিনিসই এমনি ভাবে গাঁথা হয়ে থাকে। অনেক বড় বড় বেদনা কাটা ঘায়ের মত, তারা আস্তে আস্তে শুকিয়ে যায়, কিন্তু এমন ছোট ছোট অসংখ্য আঘাত আছে, যারা কাঁটার মত মাংসের গভীরে গিয়ে প্রবেশ করে—চিরদিন তাদের অস্তিত্বকে অনুভব করতে হয়।

দু নম্বর কালো কোট আবার একদৃষ্টিতে চেয়ে রইল আমার দিকে। যেন ফরমাশ দিয়ে তৈরি। এমন অপূর্ব জীব এমনিতে পয়দা হয় না।

ঘোষের একটা হাত শক্ত করে আমার মুঠোটা ধরে রেখেছিল। অন্য যাত্রীদের কাছ থেকে টিকেট নিতে নিতে সে বলল, দেখছি আমি, জীবটি কেমন।

সেই সময় কোথা থেকে এল মহবুব মিঞা। এখন মনে পড়ছে, গাড়ি থেকে যখন আমি নামি, তখনই সে আমাকে একদৃষ্টিতে লক্ষ্য করছিল। আমিও দেখেছিলুম তাকে। চওড়া-চিতানো বুক, বাবরি করা চুল কব্জীর ওপরে মস্ত একটা সোনার ঘড়ি। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সিগারেট টানছিল।

মহবুব এগিয়ে এসে পকেট থেকে একটা এক টাকার নোট বের করে ঘোষের বুক-পকেটে গুঁজে দিল। হেসে বলল, আরে, ছোড় দিজিয়ে বাচ্চাকো মেরা আদমি—

তারপর—

তারপর আমি চমকে উঠলুম। সেই বড় ছেলেটা আমার চুল ধরে টান দিয়েছে।

কি রে, কথা বলছিস না কেন?

চুলে টান পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই আমার সারাটা শরীর খুশীতে দুলে উঠল।

মনে হল, সে খুশীর অংশ ওকেও দেওয়া দরকার। আমি তৎক্ষণাৎ লাফিয়ে পড়লুম ছেলেটার ওপরে।

লাগ্ ভেলকি লাগ্, ঘরশুদ্ধু ছেলে একসঙ্গে চেঁচিয়ে উঠল। একজন আবার গাল ফুলিয়ে পোঁ-পোঁ আওয়াজ তুলল—যেন যুদ্ধের বাজনা বাজাচ্ছে।

বেশীক্ষণ দেরি হল না। ইস্কুল থেকে বেরিয়ে আসবার সঙ্গে সঙ্গেই কোথা থেকে আরও খানিকটা হিংস্র শক্তি এসেছে আমার শরীরে। আমার অদ্ভুত অস্বাভাবিক শরীরের প্রত্যেকটা মাংসপেশী যেন জানত—পৃথিবীতে বাঁচতে হলে এবারে নিজের পায়ে আমাকে দাঁড়াতে হবে। দু মিনিটের মধ্যে ওর বুকের ওপর আমি চেপে বসলুম। তারপর ওর চুলগুলো শক্ত মুঠোতে টেনে ধরলুম।

বল্ কেমন লাগছে এইবার।

আমি হাসছিলুম, কিন্তু ছেলেটার মুখ যন্ত্রণায় নীল হয়ে গেল।

আঃ ছাড়্—ছেড়ে দে। মেরে ফেলবি নাকি?

আমার ঘাড়ে বাঘের মত কার একটা থাবা এসে পড়ল। এক টানে তুলে ফেলল আমাকে। তারপর বজ্রের মত একটা চড়। আমি হেসে উঠবার আগেই আবার সমুদ্রের মত অন্ধকার।

তার আগে বিদ্যুৎ-চমকের মত দেখলুম মহবুব মিঞার মুখ।

জ্ঞান হল একটু পরেই। জলের ছিটে দেওয়ার দরকার ছিল না, ঘাড় ঝাঁকুনিতেই আমি উঠে বসলুম।

বাঘের মত দুটো চোখ মেলে আমার দিকে তাকিয়ে ছিল মহবুব মিঞা। মুখের ভেতর কড়কড় করছিল দাঁত। বলল, ইবলিশের বাচ্চা! ফের মারামারি করবি তো জিন্দা গোর দিয়ে দেব। সোভান্ আল্লা! আসতে না আসতেই এই!

আমার নতুন জীবন আরম্ভ হল।

বাড়ির কথা ভাবি নি? অনেকবার ভেবেছি। এক-একদিন রাতে হাত বাড়িয়ে খুঁজেছি পিসিমাকে। ঘুমের ঘোরে দেখেছি, সামনে এসে দাঁড়িয়েছে আনন্দ।

আমাদের বাড়ি যাবি আজ মুরারি? মা গোকুলপিঠে করেছে, যেতে বলেছে তোকে।

চমকে জেগে উঠেছি। অন্ধকার ঘর। আরশোলা ফরফর করে বেড়াচ্ছে আশপাশে। নোনাধরা দেওয়ালের স্যাঁতসেঁতে গন্ধ ভাসছে হাওয়ায়। পাশের বিছানায় দুটো ছেলে কী গল্প করছে নীচু গলায়! বিড়ি খাচ্ছে আর হেসে উঠছে মধ্যে মধ্যে।

পিসিমা নয়—আনন্দ নয়—কেউ নয়। আমাদের সে বাড়ি নয়, টুনুকি ঝুনুকি নয়, আনন্দের সে ছবিগুলোও কোথাও নেই। কলকাতা। মুরারি বলে যে ছিল, সে মরে গেছে অনেক কাল। এখন আমার অন্য নাম। অন্য জীবন। অন্য পরিচয়।

ঘুম আর আসবে না। কান পেতে শুনেছি ওদের গল্প। এক দিন নয়, দু দিন নয়—অনেক দিন। প্রথম প্রথম তার অর্থ বুঝি নি, বুঝেছি অনেক দিন পরে। বিকৃত যৌন অভিজ্ঞতার কাহিনী। তার সঙ্গে আরও বিকৃত কল্পনার খেয়াল।

দু বার পালাবার চেষ্টা করেছি এখান থেকে, পালাতে পারি নি। মহবুব মিঞার চোখ যেন হাজারটা হয়ে পাহারা দিয়েছে। তারপর আস্তে আস্তে অভ্যস্ত হয়ে গেছি ওদের সঙ্গে। মার খেয়েছি, হেসেছি, মারামারি করে হাসিতে উতরোল হয়ে উঠেছি। মাতাল হয়ে এসে একদিন মহবুব মিঞা জানোয়ারের মত আমাকে ঠেঙিয়েছে, এক-একটা করে হাসির দমকের সঙ্গে এক-একটা করে দাগ পড়ে গেছে পিঠের ওপর।

ছেলেগুলোর সঙ্গে বন্ধুত্ব হয়ে গেল। ওরা যা শেখাতে চেয়েছিল, শিখে নিলুম। এক বছর পরে যখন স্বাধীন হয়ে কাজ করতে বেরুলুম, সেদিন নিয়ে এলুম দুটো ফাউণ্টেন পেন আর একটা মানিব্যাগ। ব্যাগে এক শো টাকার ওপর ছিল।

সেদিন আড্ডায় মহবুব ছিল, কালু ছিল, গণেশ ছিল। অর্থাৎ ওস্তাদের সঙ্গে বড় সাকরেদরা সবাই।

একগাল হেসে মহবুব আমার পিঠ চাপড়ে দিল। ব্যাগ থেকে একটা দশ টাকার নোট বের করে আমাকে দিয়ে বলল, নে—তোর বকশিশ।

কিন্তু কি করব আমি বকশিশ নিয়ে?

ছেলেগুলো জোঁকের মত আমার সঙ্গ ধরল।

চল, ফুর্তি করে আসি।

ফুর্তি? কাকে বলে তা তো ঠিক জানি না।

ওদের সঙ্গেই বেরুলুম।

রেস্তোরাঁর সঙ্গে পরিচয় হয়ে গিয়েছিল এর মধ্যেই। চপ-কাটলেট-মাংস খাওয়া হল সবাই মিলে। তারপর দলের দুজন বড় ছেলে বলল, দুটো টাকা ধার দে।

কি করবি টাকা দিয়ে?

যাব এক জায়গায়।

ওদের চোখে দৃষ্টি চকচক করে উঠল। আর সেই হাসি—যার অর্থ এর মধ্যেই আমি বুঝতে পেরেছিলুম।

বললুম, আমিও যাব।

তুই ছেলেমানুষ, এখন নয়। সময় হলে নিয়ে যাব তোকে।

ঘরে ফিরে এলুম। কেমন একটা অস্বস্তি বোধ হতে লাগল মনের ভেতরে। ওদের হাসি, ওদের গল্পের ভেতর দিয়ে যে এলোমেলো আভাস পেয়েছিলুম, সেগুলো অদ্ভুত কল্পনা তৈরি করতে লাগল।

আরও দু বছর।

এর ভেতরে আরও তৈরি হল হাত। পকেট মেরেছি, ধরা পড়েছি, মার খেয়েছি প্রচুর। কিন্তু একটা অভিজ্ঞতা এর মধ্যেই আমার লাভ হয়েছিল। দেখেছি, মার খেয়ে আমি যতই হেসে উঠি, লোকগুলো ততই ক্ষেপে যায়। ততই কিল-চড়-লাথি সমানে পড়তে থাকে আমার গায়ে।

মারকে আমার ভয় নেই; যন্ত্রণার ঘায়ে আমার হাসির যন্ত্রটা আরও দ্রুত লয়ে বাজতে থাকে। কিন্তু ভয় করি মৃত্যুকে। ভয় করি সেই সমুদ্রকে—যার শেষ নেই, যার তল নেই, যার মধ্যে আমি ডুবতে থাকি, ডুবেই চলি। হিংস্র আক্রমণের আঘাতে আমার লোহার মত শরীরটাও টলে ওঠে একসময়। একটা ঝাঁঝরির পাশে হয়তো মুখ থুবড়ে পড়ি, নিজের রক্তের স্বাদে আমার শিরাস্নায়ু আচ্ছন্ন হয়ে যায়—তারপরেই ঢেউয়ের পরে ঢেউ। প্রাণপণে হাত দিয়ে একটা কিছু আঁকড়ে ধরি, ফুটপাথের কোণা, লোহার পোস্ট, এক টুকরো পাথর। ঢেউয়ের ওপর মাথাটাকে তুলে রাখতে চেষ্টা করি, কিন্তু তারপর—

এখন আর হাসি না। হাসিটাকে বুকের ভেতরে চেপে রাখতে চেষ্টা করি। একটা অদ্ভুত ঘড়ঘড়ানি ওঠে গলা দিয়ে, চোখ ঠেলে বেরিয়ে আসতে চায়।

মারবার জন্যে যারা হাত তুলেছিল, তারা থমকে যায় এক পলকের জন্যে। মৃগী নাকি? রোগ আছে কিছু? সেই ফাঁকে সোজা রাস্তার ওপর উবুড় হয়ে পড়ি, দু হাতে চেপে ধরি মুখটা, তারপর বন্ধ হাসিটাকে মুক্তি দিই। সারাটা শরীর হাসিতে থর থর করে কাঁপতে থাকে। আবার থমকে যায় লোকে। পিঠে মাথায় পেটে কয়েকটা লাথি মেরে কদর্য গালাগাল দিতে দিতে চলে যায়।

এর মধ্যে অনেক দেখে নিয়েছি দুনিয়াকে। অভিজ্ঞতার কোথাও কিছু বাকি নেই। বকশিশের টাকা হাতে এলে এখন আর আমাকে ছেলেমানুষ বলে ওরা ফেলে রেখে যায় না।

অভ্যাসে যাই ওদের সঙ্গে। কিন্তু আমার ভাল লাগে না। সমস্ত ব্যাপারটাকেই কেমন অর্থহীন, অসঙ্গত বলে মনে হয়। মানুষ এমন অদ্ভুত হাস্যকর হয় কেন? আর সবটাই যখন এমন হাস্যকর, তখন আমি হেসে উঠলে সবাই রাগ করে কেন?

এরই এত গল্প? এর জন্যেই এত জল্পনা-কল্পনা, এত ফিস্‌ফিসানি, ধেৎ!

একদিন একজন বলেছিল, আমাদের যদি এতই ঘেন্না, তবে আসিস কেন?

ঘেন্না করি না তো। মজা দেখতে আসি।

মজা দেখতে আসেন! যেমন বিটকেল যমদূতের মত চেহারা, তেমনি কথার ছিরি! খবরদার, আর আসবি নি।

না এলে তোরা খাবি কী?—আমি চটপট জবাব দিয়েছিলুম ঃ সঙ না দেখালে তোদের তো খাওয়া জোটে না!

আমাদের খাওয়া জুটুক বা না জুটুক, তোর কি? ড্যাক্‌রা হতচ্ছাড়া-- বেরো এখান থেকে।

আমি বেরিয়ে এসেছিলুম। আর যাই নি।

সোজা গিয়ে বসেছিলুম গঙ্গার ধারে। বাঁধানো পোস্তার অনেকখানি পর্যন্ত ঘোলা জল জোয়ারে উঠে এসেছে। প্রায় জলটা ছুঁয়ে আমি ঘাটের ওপরে বসলুম।

দুটো লোক টাকা-পয়সা নিয়ে ঝগড়া করছে। একজন বলছে, তোকে দেখে নেব। দেখে নেবার জন্যে ভাবনা কি, পাশেই তো বসে আছে—যত খুশী দেখে নিলেই তো হয়। সে কথাটা অত চিৎকার করে বলার কী দরকার ছিল?

একজন কেরোসিনের টেমি জেলে ওড়িয়া ভাষায় সুর করে কি পড়ছে,

তিন-চারজন হাঁ করে তাই শুনছে। কয়েকবার 'ড়ামচন্দ্রো' 'ড়ামচন্দ্রো' শুনে বুঝলুম রামায়ণ। রামায়ণের গল্প আমি জানি। পিসিমা রামায়ণ পড়ত, আমি শুনেছি। কিন্তু গঙ্গার ধারে কেন? অমন সুর করেই বা কী হবে?

মাঝিদের দুটো নৌকো বাঁধা আছে, সেখান থেকে ইলিশ মাছের ঝোলের গন্ধ আসছে। আমার খিদে পেল। একটা বিড়ি বের করে ধরালুম পকেট থেকে।

গঙ্গার দিকে তাকিয়ে দেখলুম, আকাশটা উলটে আছে তার ভেতরে। নৌকোর ছায়াগুলো উলটো, নানা রঙের আলো যেন জলের মধ্য থেকে জ্বলে উঠছে। তাকিয়ে থাকতে থাকতে কেমন ঘোর এল—মনে হল সব উলটো-পালটা; নৌকোগুলো আঁকাবাঁকা; আলোগুলো ভাঙাচুরো—কোনও কিছুর কোন মানে হয় না। গঙ্গায় ঢেউ দিয়েছে, জলের আওয়াজ উঠছে পোস্তার গায়ে। আমার মনে হল, পরিষ্কার একটা হাসির আওয়াজ আমি শুনতে পেলুম।

আর মনের ভুলে, বিড়ির জ্বলন্ত দিকটা উলটো করে যেই মুখে দিতে গেছি—অমনি চমকে উঠলুম। ঠোঁটটায় ছ্যাঁক্ করে উঠল, হেসে উঠেই বিড়িটাকে ছুঁড়ে ফেলে দিলুম জলের ভেতরে।

শালা!

গালটা আমি দিতে যাচ্ছিলুম, তার আগেই আর একজন দিল। তাকিয়ে দেখি, সেই টাকা-পয়সার হিসেব যারা করছিল, তাদেরই একজন। এখন মুখোমুখি উঠে দাঁড়িয়েছে।

আর একজন আরও যাচ্ছেতাই করে গালাগালি দিল।

যে শালা বলেছিল, সে যেতে যেতে মুখ ফেরাল। বলল, আচ্ছা মনে থাকবে—দেখে নেব তোকে।

লিস। আমিও দেখে লুব তোকে। নাম ভুলিয়ে ছেড়ে দুবো।

দেরি করবে কী হবে এখনই দেখে নাও না। আর দেখে নিলেই বা নিজের নাম ভুলবে কেন! আমি ভেবে পেলুম না।

ও-রকম লোকে বলে। কিন্তু কেন বলে?

গঙ্গার জলে সব এলোমেলো, আঁকাবাঁকা, ভাঙাচুরো দেখাচ্ছে। আলো-গুলো যেন জ্বলছে জলের তলায়। আকাশটা নেমে পড়েছে গঙ্গায়। গঙ্গা আকাশে উঠলে কেমন হয়!

জোয়ারের জলে হাসির শব্দ। আমি উঠে পড়লুম।

উঠে হাঁটতে লাগলুম পথ দিয়ে। বুড়ো রিক্‌শওলার গাড়িতে চেপে দুটো মোটা মোটা লোক বলছে, জলদি চলো—জলদি চলো। বুড়োটার মুখ দিয়ে ফেনা গড়াচ্ছে বলে মনে হল।

একটা মোটা ষাঁড় বসে বসে জাবর কাটছে, তার দুটো শিঙে আর কপালে কারা যেন সিঁদুর মাখিয়ে দিয়েছে! ষাঁড়ের কপালে সিঁদুর কেন? সিঁদুর তো বিয়ে হলে মেয়েরা কপালে দেয়!

গরমা গরম ডালমুট বেচছে একজন, দেখলুম সেগুলো দু দিনের বাসী। রাস্তার ওপর দাঁড়িয়ে আধবয়েসী একজন বিধবা চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বলছে, 'অমন ভাসুরের মুখে ঝাড়ু'—কিন্তু তার হাতে ঝাঁটা নেই, ভাসুরকেও কোথাও দেখতে পেলুম না।

মেয়েটা রাগ করে বলেছিল এখানে মজা দেখতে আসিস কেন?

সত্যিই তো। তাকিয়ে দেখি, মজার অভাব কোথাও নেই। কষ্ট করে, পয়সা খরচ করে কেন যাই ওদের ওখানে? যারা ওখানে মাতলামি করে, মদ খেয়ে যারা ওই মেয়েদের পা জড়িয়ে ধরে বলে—'তুই আমার ঘরে চল্, বৌটাকে লাথি মেরে তাড়িয়ে দেব', আবার একটু পরে বৌয়ের জন্য কাঁদতে আরম্ভ করে, তাদের চাইতেও অনেক রগড় এই চারদিকেই ছড়িয়ে আছে। একটা পা-কাটা রোগা কুকুর সমানে খ্যাঁক খ্যাঁক করে চ্যাঁচাচ্ছে, অথচ যে কুকুরটাকে দেখে এত লম্ফঝম্প, সে তেড়ে এলে ওকে টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলে দেবে।

দেওয়ালের গায়ে বড় বড় করে নিষেধ লেখা আছে, আর তারই তলায় সার দিয়ে বসেছে তিনজন লোক। তার কাছেই তেলেভাজার দোকানে বসে একটা পুলিস প্রায় চোখ বুজে ফুলুরী খেয়ে চলেছে। কোমরের পেটিটা আধখানা খোলা লাঠিটা এমন ভাবে রয়েছে যে, কেউ ইচ্ছে করলেই সেটা নিয়ে সরে পড়তে পারে।

পুলিসটার সঙ্গে চেহারার মিল আছে বলেই বোধ হয়, আমার মহবুব মিঞাকে মনে পড়ল। ওই তো জোয়ান—অমনি বাঘের মত শরীর। কিন্তু একটু জ্বর হলেই কেমন কাঁদতে থাকে ছেলেমানুষের মত। কোন্ এক লাল বিবিকে তার মনে পড়ে। দশ বছর আগে সে ফৌত হয়েছে, অথচ একটানা ফোঁপাতে থাকে তার জন্যে। আর বলে ময়, আপ্‌না ঘর চল্ যাউংগা—জরুর চলা যাউংগা—

অথচ মহবুব মিঞার ঘর নেই। আমরা জানি, অনেককাল আগেই কুশী নদীর বানে সে ঘর ভেসে গেছে। এই কলকাতার রাস্তাতেই তাকে একদিন কুকুরের মতো মুখ থুবড়ে পড়ে মরতে হবে।

চলতে চলতে শ্মশানের সামনে এসে দাঁড়ালুম। কী ভেবে ঢুকে পড়লুম তার ভেতরে।

কালি-পড়া দেওয়াল, মানুষের নামের আঁচড় এদিকে ওদিকে। খুব বড় বড় হরফে এক জায়গায় পোড়া কয়লা দিয়ে লেখা ঃ 'হরবল্লভ দে সরকার, সাং জনাই, জেলা হুগলী, মৃত্যু--১৩—

নিমতলার শ্মশানে পুড়ে যে কবে ছাই হয়ে গেছে, তার সাকিন কার কী কাজে লাগবে আমি ভেবে পেলুম না। কেউ কি সেখানে তাকে চিঠি লিখবে, না খুঁজতে যাবে? বরং ভূত যদি হয়ে থাকে, তা হলে কোন্ গাছে বাসা বেঁধেছে সেটা জানতে পারলে তার শত্রুরা নিশ্চিন্ত হত।

কথাটা মনে আসতেই আমার হাসি পেল। আমি হা-হা করে হেসে উঠলুম।

একটা সাধু গাঁজা খাচ্ছিল, সে চোখ লাল করে তাকালো আমার দিকে। আধপোড়া চিতার পাশে বসেছিল চার-পাঁচজন, তারাও চোখ ফেরাল।

পাগল নাকি?

বরমদেও ভি হো সকতা! সুরত্ দেখো এক দফে! সিয়ারাম—সিয়ারাম!

তখন আমার চিতার দিকে চোখ পড়ল। বাঁশ দিয়ে ডোম চিতা ঝাড়ছে, আগুনের ফুলকি ছিটকে পড়ছে চারপাশে। আমি হঠাৎ মড়াটাকে দেখতে পেলুম। একসময় নিশ্চয় মানষ ছিল, হয়তো আমার মত বীভৎস ছিল না—হয়তো খুব চমৎকার ছিল চেহারা। কিন্তু এখন? একটা কোঁচকানো কালো পুতুলেব মত দেখতে—নাক নেই, মুখ নেই, কিচ্ছু নেই। যেমন বিকট, তেমনি কদাকার।

হেসে উঠতে গিয়েও আমি হাসতে পারলুম না। মনে হল, একদিন যখন অমনি করে আমিও চিতার আগুনে পুড়তে থাকব, তখন কারও সঙ্গে আমার কোনও তফাত থাকবে না। একটা খোলসের তলায় সব এক রকম—সমান কুৎসিত সমান অসঙ্গত, সমান হাস্যকর। পেটের দায়ে যে মেয়েরা সঙের খেলা দেখায়, তারা জানে একদিন না একদিন সবাইকেই সঙ সাজতে হবে। কেউ বাদ যাবে না—কেউ নয়।

॥ চার ॥

দল বেঁধে ছবি দেখতে গেছি সবাই। আমরা তো আছিই, গণেশও জুটেছে সঙ্গে। গণেশ কখনো পয়সা দেয় না—আমাদেরই দিতে হয় ভাগাভাগি করে। না দিলে লাগিয়ে দেয় মহবুবের কাছে। সত্যিমিথ্যে বানিয়ে বলে। বলে দেয়—অমুক একটা ফাউণ্টেন পেন সরিয়ে চৌরঙ্গিতে পাঞ্জাবীর দোকানে বিক্রী করে দিয়েছে—অমুক একটা ব্যাগে দুশো টাকা পেয়েছিল, তার কুড়ি টাকা জমা দেয় নি।

আর মহবুব মারে। নির্দয়ভাবে মারে সবাইকে। মাথার চুল ছিঁড়ে দেয়—এমন ভাবে বেত চালায় যে পিঠের চামড়া ফেটে রক্ত গড়াতে থাকে। শুধু আমার গায়ে হাত দেয় না সহজে। জানে, এই বয়েসেই অদ্ভুত শক্তি আমার গায়ে—একবার যদি আমার হাসিতে ঝড় ওঠে—তা হলে মহবুবেরও খুব আরাম লাগবে না। ওর বাঁ হাতের পিঠে যে তিনটে শাদা দাগ জ্বলজ্বল করছে ওখানে দাঁত বসিয়ে আমিই মাংস তুলে নিয়েছিলুম।

আমি দেখেছি। সেই সেকেণ্ড মাস্টারকে দিয়েই দেখেছি। যারা অন্যকে মারতে ভালবাসে, তারাই মার খেতে ভয় পায় সবচাইতে বেশি। দেখেছি, যে পাহারাওলা গরিব রিক্‌শাওলার হাত মুচড়ে পয়সা কেড়ে নেয়—রাস্তায় সোডার বোতল ছোড়াছুড়ি আরম্ভ হলে সে-ই দৌড়ে পালায় সকলের আগে।

তাই গণেশও আমাকে খাতির করে। বলে, ওটা শয়তান। ক্ষুদে হলে কী হয়, আসল শয়তান। ওকে ঘাঁটাতে নেই।

সে-কথা থাক।

সবাই মিলে ছবি দেখলুম। মহাভারতের গল্প। এ গল্প আমি পড়েছি, কতদিন ছুটির দিনে দুপুরে মহাভারত পড়ে শুনিয়েছি পিসিমাকে। শুনতে শুনতে পিসিমার নিঃশ্বাস পড়েছে কতবার, চোখ দিয়ে জল গড়িয়েছে।

কিন্তু তাজ্জব—ক্যা তাজ্জব! সেই গল্পকেই কিভাবে ভোল পাল্‌টে দিয়েছে দ্যাখো। নাচ-গান হুল্লোড়—কত কী! কী ভঙ্গি করছে মেয়েরা—কী চোখমুখ—কী কাপড়চোপড়! হল শুদ্ধু লোক শিটি দিচ্ছে—হাসছে, হৈ-হৈ করছে! একজন তো গরম হয়ে চেঁচিয়েই উঠল ঃ লে আও—পাকড় লাও উস্‌কী! আর একজন নাচ দেখতে দেখতে তাল পাকিয়ে একটা রুমালই ছুড়ে দিলে পর্দার উপর।

এ যদি ছবি না হত—তা হলে কী যে হত ভাবতে পারা যায় না। মাংসের দোকান থেকে একটা হাড় ফেলে দিলে কুকুরগুলো যেমনভাবে তার উপর গিয়ে পড়ে--ঠিক তেমনি একটা দৃশ্য তৈরি হত এখানে! আশ্চর্য, এই মহাভারত পড়তে পড়তে পিসিমা কাঁদত! এই ছবি দেখলে কী বলত পিসিমা—কেমন লাগত তার?

"ফাগুনাকে রাতিয়া আও মেরী রাজা—
কোয়েলা রোতীয়া—ও মেরী রাজা—"

সিনেমা থেকে বেরিয়ে গান ধরেছে গণেশ। একটা কুকুর ময়লা খাচ্ছিল ডাস্টবিনে—গান শুনে কী ভেবে গুটি গুটি পায়ে এগিয়ে আসতে লাগল আমাদের দিকে।

সঙ্গে সঙ্গে হারুণ সুর ধরে দিলে ঃ

"আয়া তেবা রাজা--হো ভাই গণ্‌শোয়া—
আ গিয়া কুত্তা—তেরা পরদেশিয়া—হো ভাই—"

শেষ করার আগেই গণেশ তেড়ে গেল হারুণের দিকে। এক লাফে তিন হাত সরে গেল হারুণ--সবাই হেসে উঠল হো-হো করে।

ঠিক তখনই হৈ-হৈ শব্দ উঠল ট্রাম-স্টপের সামনে।

আমরা ছুটে গেলুম।

দেখলুম, পাঁচসাতজন ভদ্রলোক একজনের গলা চেপে ধরেছে। ধরেছে যাকে, তাকে দেখেই চিনতে পারলুম। পরণে পা-জামা ফুলকাটা পাঞ্জাবী, গলায় ছিটের রেশমী রুমাল। গালের কষে পানের দাগ। এই লোকটাকেই দেখেছিলুম চেঁচিয়ে উঠতে ঃ পাকড় লাও—লে আও উস্‌কী—

খুব গরম হয়ে গিয়েছিল মহাভারতের গল্প দেখে। খুব তেতে উঠেছিল হলের ভেতর।

সেই ঝোঁকটাই বোধ হয় ছিল মনের মধ্যে। তাই মাথা ঠিক রাখতে

পারে নি। টেলিফোনের একটি মেয়ে ট্রামে উঠতে যাচ্ছিল, ফস্ করে কী বলে বসেছে তাকে।

মার শালাকে—

ইয়ার্কির জায়গা পাও নি শুয়োরের বাচ্চা!

গালি মৎ দিজিয়ে!—শেষ গালটা সইতে পারল না, দুর্বলভাবে আপত্তি করল।

গাল দেব না!—ঠাস করে একটা চড় পড়ল লোকটার গালে।

আমার আকাশ ফাটিয়ে হা-হা- করে হেসে উঠতে ইচ্ছে করল! বলতে ইচ্ছে করল ঃ 'দেখো দেখো তামাসা দেখো- দেখো ইয়ে বম্বইকা খেল্!' এই হচ্ছে দুনিয়ার হালৎ! মহাভারতের নামে ছবি দেখাবে—আমাদের মতো গরিব মানুষের মাথায় দেবে রক্ত চড়িয়ে—তারপর সেই নেশায় কেউ একটু বে-হাল হলেই চোরের মার লাগাবে তাকে! ধর্মের গল্পের নামে নোংরা করবে মানুষের মেজাজকে, আর একটু নোংরামি করে ফেললেই হাত চালাবে তার উপর। নাঙ্গা নাচ দেখিয়ে তাতিয়ে দেবে, তার কানে কানে বলবে ঃ 'রাম কহো—রাম করো!' কেন?

কেন? এই কথাটারই জবাব কেউ পায় না—কোথাও পায় না। এখানে সব এলোমেলো—সব উল্টো-পাল্টা। এখানে আকাশটা পর্যন্ত উলটো হয়ে ঝুলে থাকে মাটির দিকে—এখানে যে মানুষ শ্মশানের চিতায় পুড়ে দশ বছর আগে ছাই হয়ে গেছে, তার নাম-ঠিকানা লেখা থাকে শ্মশানের দেওয়ালে! এখানে যে মেয়েরা চুর্‌চুরে নেশায় হাসিতে টুকরো টুকরো হয়ে ফেটে পড়েছে—তাদেরই দেখেছি পরে বিছানায় মুখগুঁজে ফুলে ফুলে কাঁদতে; এখানে মানুষ না খেয়ে ধুঁকতে ধুঁকতে মরে যায়—আর সায়েবের আর্দালীকে দেখি কুকুরের জন্যে রুটি আর মাংস কিনে নিয়ে চলেছে!

গণেশ বললে, কেন বাবা ভদ্দরলোকের মেয়েছেলের দিকে নজর দাও? এখন খাও ঠ্যাঙানি—। সখ থাকলে পাড়ায় গেলেই পারো।

পাড়া তো আইন করে তুলে দিচ্ছে। যাবে কোথায় তখন?

হুঁ—আইন করে তো সবই হচ্ছে! সোজা রাস্তা বন্ধ হলে তখন সিঁধ কাটবে লোকে। নে—চল্ এখন—

ঠিক কথা। গণেশ মিথ্যে বলে নি। চারদিকে তাই তো দেখছি। এক কানে বলছে 'ভালো হও'—আর এক কানে মন্তর দিচ্ছে ঃ 'চুরি করো।' এ-ই

দুনিয়া।

আমিও ছাড়ি নি। যে-লোকটা চড় মারছিল, তার পকেট থেকে ব্যাগটা সরিয়েছি এক ফাঁকে। এই ব্যাগটার কথা কাউকে জানতে দেওয়া নয়। আমার অন্য কাজ আছে।

কাজটা কী?

ভাবতে হাসি পায়। ওই মেয়েদের একজনকে আমি মধ্যে মধ্যে দু একটা টাকা দিয়ে আসি।

সারি সারি ঘরে ওরা থাকে। রোজ সন্ধ্যায় আসে লোকের পর লোক-নাচ চলে, গান ওঠে, হুল্লোড় হয়। ষাট বছরের বুড়ো থেকে পনেরো বছরের ছেলে—কত আসে কত যায়। ঠিক একপাল শকুনের মতো দেখায়—পচা মড়ার গন্ধে উড়ে এসে বসেছে সব।

শুধু একটা ঘরেই দেখি, প্রায় একমাস ধরে লোক ঢোকে না। কোনোদিন আলো জ্বলে কখনো অন্ধকার। কেমন অদ্ভুত লাগল—দরজা ঠেলে ঢুকে পড়লুম একদিন।

মেঝেতে ময়লা বিছানা পেতে পড়েছিল মেয়েটা। হাড়-চামড়া একাকার হয়ে গেছে শরীরে। মাথার কাছে একটা বাটির মধ্যে দুটো রুটি আর খানিক কালো তরকারী কুঁজো আর গ্লাশ, একটা ওষুধের শিশি।

আমি যখন ঘরে ঢুকলুম তখন কম পাওয়ারের একটা আলো জ্বলছিল। সেই আলোয় চমকে মেয়েটা তাকালো আমার দিকে। আমার অদ্ভুত চেহারাটা বোধ হয় ওর ভয়ঙ্কর বলে মনে হল তখন। ভাবল যমে নিতে এসেছে।

আঁতকে চেঁচিয়ে উঠল ঃ কে—কে তুই?

কী হয়েছে তোর?

এইবারে চিনতে পারল। চুপ করে থাকল কিছুক্ষণ। তারপর বললে, কেন এলি এখানে? আমি তো মরতে বসেছি—কেন এলি জ্বালাতে?

মরতে বসেছিস? বাঁচবি তা হলে।

অন্য ঘরে যা তুই। এখানে কী চাস?

কিচ্ছু চাই না। আমার কাছে তোদের সব ঘরই সমান। আমি এখানেই বসব।

বসলুম। আবার কিছুক্ষণ চুপ করে রইল মেয়েটা। তারপর আস্তে আস্তে বললে আমার খুব অসুখ করেছে রে। আমি সত্যিই বেশিদিন আর বাঁচব না। তার উপর ওষুধ নেই—খেতে পাই না। ওরা কেউ কিছু কিছু এনে দেয়—তাও রোজ খেতে পারি না। ওই দ্যাখ—সকালে রুটি দিয়ে গেছে, একটুকরো খেয়ে বমি করে ফেললুম। তুই যদি এসেছিস—জল গড়িয়ে দে।

দিলুম এক গ্লাশ জল। অনেক কষ্টে, আধখানা উঠে জল খেলো খানিকটা। তারপরে শুয়ে পড়ে বললে, অনেক উপকার করলি তুই। তোর ভালো হবে।

আমার ভালো হবে! হাসতে গিয়ে হাসতে পারলুম না।

তুই আর এখানে আসিস নি। আমার রোগ ছোঁয়াচে।

আমার কিচ্ছু হবে না। মহবুব বলে, লোহা দিয়ে তৈরি আমার শরীর। কিন্তু তবু আমি আসব তোর এখানে। কেন জানিস? এইটে দেখতে আমার ভালো লাগবে তোরা সব এমনি করে সাবাড় হয়ে যাচ্ছিস।

পকেটে চারটে টাকা ছিল। সেইটে রেখে দিলুম মেয়েটার মাথার কাছে। তারপর কিছু ও বলবার আগেই বেরিয়ে চলে এলুম ঘর থেকে।

মরছে মেয়েটা। ওরা সবাই মরবে—অমনি করেই মরবে। আমি এবারেও হেসে উঠতে গিয়ে হাসতে পারলুম না। কেন জানি না—আমার পিসিমাকে মনে পড়ছে, মনে পড়ছে আনন্দকে—মনে পড়ছে তার বোন দুটিকে—সেই কচি ঘাস, জবাফুল আর শিউলি-বোঁটার রঙ দিয়ে আঁকা ছবিগুলোকে।

আবার ফিরে যাওয়া যায়? সেই গ্রামে? বাবা বেঁচে আছে? কেমন আছে পিসিমা? কত বড় হয়েছে আনন্দ? এই পাঁচ বছর পরে?

সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে ধাক্কা লাগল। পাকা চুল এক বুড়ো উঠে আসছে—হাতে বেলফুলের মালা। আমি জানি ওকে। একটু পরেই নাতনীর বয়েসী একটা মেয়ের ঘরে গিয়ে বসবে! লোকটার মুখখানাকে হঠাৎ যেন সেকেণ্ড মাস্টারের মতো মনে হল আমার। ইচ্ছে করল, পাগলের মতো হেসে উঠে ওর ঘাড়ে আমি ঝাঁপিয়ে পড়ি।

কিন্তু আমি নেমে চলে এলুম।

আজকের এই লুকোনো মানি-ব্যাগের টাকা ওই মেয়েটাকেই আমি দিয়ে আসব। মেয়েটা বাঁচবে না। যখন টাকার দরকার ছিল তখন পায় নি—আজ মরবার আগে কোনো অভাব আমি ওর রাখব না! এ নইলে আর মজাটা হল কোথায়!

আর নয়। এইবারে আমার কথা কিছু সংক্ষেপ করে আনব।

আমি চতুর্থবার জেলে গেলুম। এবার ঠেলল ছ' মাস। বেরিয়ে আসতেই পথে হারুণের সঙ্গে দেখা।

মহবুব মিঞা খুন করেছে কালুকে। যে মেয়েটাকে টাকা দিয়ে রেখেছিল মহবুব, কালু নাকি চুপিচুপি আসা-যাওয়া করত তার কাছে। একদিন তৈরি হয়েই যায় মহবুব, হাতে হাতে ধরে কালুকে, তারপর বড় ছোরাটা সোজা কালুর পেটের মধ্যে চালিয়ে দেয়। সেই থেকে মহবুব ফেরার। আড্ডার উপর পুলিসের চোখ পড়েছে, গণেশ আর আসতে ভরসা পায় না, ছেলেরা সব ছিটকে পড়েছে এদিক-ওদিক।

হারুণ আমাকে বললে, শোন্ ইয়ার। আমি আছি খিদিরপুরে। শেখ জুম্মার আড্ডায়। যাবি?

আমি চুপ করে রইলুম। চোখের সামনে কালুর চেহারাটা ভাসছিল। ডান হাত ছিল সে মহবুবের। অথচ তাকেই খুন করে ফেলল একটা মেয়ের জন্যে? অথচ মেয়েরা—

আমি হেসে উঠলুম।

হারুণ বিরক্ত হয়ে বলল, তোর হাসির পাগলামো বন্ধ কর্। যাবি?

না।

চল্ না। ওখানকার কাজ আরও ভাল। খুব জবর কারবার। ডকের মাল-সরানো আছে জাহাজে থেকে আফিং-সোনা পাচারের কাজ আছে। লাল হয়ে যাবি।

বললুম মরবার পরে তুই কালুকে দেখেছিলি? কালু হাসছিল?

হারুণ গাল দিয়ে বলল, তোর সত্যিই মাথা খারাপ। চুলোয় যা তুই। তবে যদি কখনও বেকায়দায় পড়িস খিদিরপুরে মজিদ মিঞার হোটেলে খোঁজ করিস। বাজারের ওপরেই।

হারুণ চলে গেল।

আমি কালুর মুখটাকে ভাবতে চেষ্টা করছিলুম। দুটো সোনা-বাঁধানো দাঁত ছিল ওর। নানারকম কাজ করত কালু। একদিন সন্ধ্যার সময়ে আমি ওর সঙ্গে গিয়েছিলুম। চৌরঙ্গীর পেছন দিকে ঘুরঘুর করত। লোক বুঝে তার কাছে গিয়ে ফিসফিসিয়ে বলত, প্রাইভেট স্যার, স্কুল-গার্ল, অন্লি সিক্সটিন—

দেখলুম বেশ ঝকঝকে তকতকে একটি ভদ্রলোক ওর পিছু পিছু রিক্‌শায় গিয়ে উঠল।

আমি দাঁড়িয়ে ছিলুম। কালু ফিরে এল একটু পরেই। সেই সোনা-বাঁধানো দাঁতের ঝিলিক দেখিয়ে হেসে বলল, বারো টাকা দালালী পেলুম। মেম সায়েবের কাছ থেকেও পাব।

আমি কালুর সেই দাঁতগুলোর কথাই ভাবছিলুম। মরবার সময় কি তেমনি দাঁতের ঝলক বের করে হেসেছিল কালু? আর মহবুব কি খুলে নিয়েছিল দাঁত দুটো? বেশ খানিকটা সোনা ছিল তাতে।

কিন্তু কালুর কথা থাক্‌। আমি কোথায় যাই?

আড্ডা ভেঙে গেছে, মহবুব ফেরার। কারও কাছে আমার কোনও দায় নেই। দেশে ফিরে যাব? একটা পার্কে এসে বসে ভাবতে লাগলুম, কেমন হয় ফিরে গেলে?

পাঁচ বছর পার হয়ে গেছে, পিসিমা কি বেঁচে আছে এখনও? বাবা কি আজও তেমনি করে আখের ক্ষেতের পাশ দিয়ে, পদ্মদীঘির ধার দিয়ে সেই ইস্কুলে পড়াতে যায়? এখনও কি সেই সেকেণ্ড মাস্টার তেমনি করে ছেলেদের নিয়ে মজা করতে ভালবাসে? চার বোনের এক ভাই আনন্দ কেমন আছে এখন—কত বড় হয়েছে সে?

ফিরে যাব? না—আর ফেরা যায় না। ফিরলে আবার বাবা, আবার স্কুল, হয়তো আবার সেই সেকেণ্ড মাস্টার। নাঃ, আর উপায় নেই ভাব। গ্রামে গিয়ে আমি থাকতে পারব না।

পিসিমাকে আমি তো প্রায় ভুলেই গেছি, সে-ই কি আর মনে রেখেছে? আর বাবা তো আমাকে ভুলতে পারলেই খুশী হয়। আনন্দর কত বন্ধু জুটেছে এতদিনে। আমি পকেটমার, আমি জেল খেটেছি আমার জীবন একেবারে আলাদা হয়ে গেছে। কী হবে ফিরে গিয়ে? কারও সঙ্গেই আমার আর মিলবে না।

কিন্তু আমারও আর ভাল লাগে না। এখন মনে হচ্ছে হঠাৎ যেন ছুটি পেয়ে গেছি। এতদিন সব সময় মহবুবের ছায়াটা পেছনে দাঁড়িয়ে থাকত—যেন নিজের ইচ্ছেয় কিছু করি নি, তার ভয়টাই আমাকে দিয়ে সব কিছু করিয়েছে। আর নয়। এ আর আমার ভাল লাগে না।

একটা কিছু চাই। আমার বার বার মনে হয়েছে, এ আমার কাজ নয়।

হাসির মসলা দিয়ে আমি তৈরি হয়েছিলুম, নিজে হাসব, সকলকে হাসিয়ে যাব। এখন দেখছি, এতদিন নিজে হাসতে পারি নি, প্রতি মুহূর্তে হাসিটাকে আমায় প্রাণপণে চাপতে চেষ্টা করতে হয়েছে। মার খেয়ে যত হেসেছি, মারের জোরটা তত বেড়ে উঠেছে। তারপর চোখ ভরে সেই অন্ধকার নেমে এসেছে—যাকে আমি এত বেশি ভয় করি; আর সেই অন্ধকারে চেতনার শেষ বিন্দুগুলো জোনাকির মত জ্বলে উঠেছে--যেমন দেখেছিলুম সেই পালানোর রাত্রে—সেই মড়ার খুলিটাব ওপরে।

কাউকে হাসাতে পেরেছি? না। আমার দিকে আচমকা চোখ পড়লে লোকে কেমন আঁতকে উঠেছে। পকেট মেরে নিরাপদ জায়গায় সরে এসে দেখেছি লোকটার হাউ হাউ কান্না ঃ মাইনের টাকাটা নিয়ে গেল মশাই, এবার সারা মাস উপোস করতে হবে ছেলেপুলে নিয়ে। আমার সর্বনাশ করে দিয়ে গেছে।

কান্না দেখলে আমার হাসি পায়। জ্বরের ঘোরে মহবুব যখন লাল বিবির জন্যে ডুকরে উঠত, তখন হাসি চাপবার জন্যে ঘরের বাইরে বেরিয়ে যেতুম। হাসতে দেখলেই ওই অবস্থাতেও মহবুব জলের গ্লাস ছুঁড়ে মারবে, যা মুখে আসে তাই বলে গালাগাল দেবে। দলের ছেলেরা কেউ লাগতে এলে যখন তার হাত মুচড়ে ধরেছি, আর মুখটাকে অদ্ভূত করে সে চেঁচিয়ে উঠেছে, তখন হেসেছি প্রাণ খুলে। কিন্তু আস্তে আস্তে দেখেছি সব কান্নায় হাসি পায় না, কখনও কখনও বুকের ভেতরটায় কেমন যেন টনটন করে ওঠে।

এ কাজ আমার নয়। এ সব আমি ছেড়ে দেব। এতদিন যা করেছি, নিজে করি নি, মহবুব করিয়েছে আমাকে দিয়ে। এবার নিজের মত করে কাজ আমায় খুঁজে নিতে হবে। এখন আমার নিজের পথ।

॥ পাঁচ ॥

নিজের পথ তো বটে—কিন্তু তার হদিশ পাই কোথায়?

তিন চারদিন এলোমেলোভাবে ঘুরে বেড়ালুম। জেল থেকে বেরুবার সময় নিজের যে তিনটে টাকা পকেটে ছিল, তাইতে চলল এই ক'দিন। ভবানীপুরের গলিতে পাঞ্জাবীদের একটা চাকাখোলা বাস পড়ে ছিল তারই মধ্যে দু রাত ঘুমোনো গেল।

কিন্তু কী করা যায়?

শেষে বিরক্ত ধরে গেল। একদিন হাঁটতে হাঁটতে চলে গেলুম খিদিরপুরে। মজিদ মিঞার হোটেলও পাওয়া গেল।

গুণীর জায়গা বটে। কত রকম লোক আসে যায়! বিলিতী মদ থেকে সোনার ঘড়ি, আংটি—ক্যামেরা কত রকম জিনিস নিয়ে আসে খালাসীরা! কোকেনের পুরিয়া, আফিঙের প্যাকেট। রুটি আর মাংস খেতে খেতে হাতে হাতে পাচার হয়। কলকাতায় আমাদের সে আড্ডা আর কতটুকু—এখানে যেন সারা দুনিয়ার সমস্ত চোর-জুয়াচোর এসে জড়ো হয়েছে।

বাইরে হোটেল, ভিতরে তিন চারটে খুপরি। সেই খুপরির একটাতে অনেক মুর্গী থাকে—আর থাকে হারুণ। আমিও জায়গা পেলুম হারুণের কাছেই। রাত্রে ঘুমের মধ্যে মুর্গী এসে গায়ে চড়াও হয়, পোকা উঠে আসে। বিছানা নোংরা করে—ভোরবেলা বেয়াড়া গলায় চ্যাঁচায়। গলা টিপে সাবাড় করে দিতে ইচ্ছে হয় ওগুলোকে।

আমার মনে আছে। ছেলেবেলায় মুসলমানপাড়া থেকে কী করে একটা মুর্গী এসে ঢুকেছিল বাড়ীতে। হৈ-হৈ করে তাড়িয়ে দেওয়া হল তাকে—যেখানটায় সে এসেছিল সেখানে ছড়িয়ে দেওয়া হল গোবরজল। আর পিসিমার সে কি চিৎকার!

হোটেলের এই ঘরে একবার পিসিমাকে নিয়ে এলে কেমন হয়?

হারুণ মাঝরাতে জেগে উঠে বললে, কি রে, হাসছিস যে?

এমনি।

তোর মাথা খারাপ। কালকে চল—ডকে নিয়ে যাই। দেখবি কি রকম মজা!

মজার জন্যেই তো এসেছি দুনিয়ায়। মজা করব, মজা দেখব। এ ছাড়া আমি কী করতে পারি আর? আমার জন্মের সময়ের ছ'টা আঙুলে, আমার বিকৃত বীভৎস চেহারায় সেই কথাই তো লেখা আছে।

পরদিন ডকের বাইরে এসে দাঁড়িয়েছি দু'জনে। জাহাজের ক্রেণ থেকে মালপত্তর উঠছে নামছে। লরী বোঝাই হয়ে চলে যাচ্ছে—ট্রেন চলেছে স্ট্র্যাণ্ডের রেললাইন ধরে। কত রকমের মানুষ—কত ব্যস্ততা!

হঠাৎ হারুণ আমার গা টিপল।

ওই দ্যাখ।

কী দেখব?

ওই যে লোকটা—একটা বিড়ি ধরালো? উঠে পড়ল রিক্‌শায়—দেখছিস না? আয়—

কোথায় যেতে হবে?

আয় না।

রিক্‌শাটা আস্তে আস্তে চলেছে, আমরা পিছু নিলুম। রাস্তার ভিড়ের মধ্য দিয়ে, দু তিনটে বাঁক ঘুরে রিক্‌শা একটা গলির মুখে থামল। পয়সা মিটিয়ে দিয়ে লোকটা ঢুকল গলিতে।

বললুম, কোথায় নিয়ে চললি হারুণ?

হারুণ বললে, ভাবিস নি—আমার চেনা লোক—জাহাঙ্গীর ওস্তাদ। শেখ জুম্মার পয়লা সাগরেদ। ডক থেকে মাল সরিয়ে নিয়ে এল।

মাল সরিয়ে আনল? আমি আশ্চর্য হয়ে বললুম আমি তো কিছু দেখতে পেলুম না।

তুইও যদি দেখতে পাবি, তাহলে এতগুলো পাহারার সামনে দিয়ে জিনিস বের করে আনবে কী করে? আয়—দেখাচ্ছি তোকে।

গলির ভেতরে একতলার ঘরটার দরজা বন্ধ। উল্‌টো দিকেই একটা

হোটেলে ভাজা হচ্ছে শিকে গাঁথা সারি সারি কাবাব। একটা পাগল কাছাকাছি বসে হা-হা করে নিঃশব্দে হাসছে—গালের ময়লা দাড়ির ওপর দিয়ে থুথু গড়িয়ে পড়ছে তার।

ভাজা কাবাবের গন্ধে কেমন গুলিয়ে গুলিয়ে উঠছে শরীর। অমনভাবে হাসছে কেন পাগলটা? ওকি আমারই দলের? চারদিকেব এই রগড়ের হাট দেখে হেসে আর কূল পাচ্ছে না?

হারুণ দরজার কড়া নাড়ছিল। সেই লোকটাই খুলে দিলে। একবার আমার দিকে ক্রুর দৃষ্টি ফেলে বললে, এটা আবার কে? এই জিন্দা ইব্‌লিশকে নিয়ে এলি কোত্থেকে?

ভয় নেই। ও আমার পুরোনো দোস্ত, মহবুবের আড্ডার লোক।

কেত্‌না চীজ্‌নে বনায়া খোদা! আয় ভেতরে--

ঢুকলুম ভেতরে। হারুণই বন্ধ করে দিলে ভেতরেব খিলটা। তারপর জিজ্ঞাসা করলে, আজ কী পেলে ওস্তাদ?

দিনের বেলাতেই আলো জ্বলছে। জাহাঙ্গীর ওস্তাদ গায়ের শার্টটা খুলে ফেলল। বললে, দেখো—

হঠাৎ আমার চোখে যেন ধোঁকা লেগে গেল। মনে হল জাহাঙ্গীরের গায়ে কিলবিল করছে অসংখ্য সাপ—চিকচিক করছে—ঝিকমিক করছে। নিজের চোখকে আমি বিশ্বাস করতে পারলুম না। পা থেকে মাথা পর্যন্ত বিদ্যুতের ঘায়ে চমকে উঠল আমার।

হারুণ বললে, দেখছিস কি—লোহার চেন।

লোহার চেনই বটে! কত গজ হবে কে জানে—গায়ে পাকে পাকে জড়িয়ে এনেছে।

জাহাঙ্গীর হাসল আমার দিকে তাকিয়ে ঃ বাত্‌চিত্‌ রুখ্‌গিয়া—ক্যা?

বললুম, জী ভাইসাহেব।

হারুণ গর্বের সুরে বললে, এ আর কী দেখছিস! জাহাঙ্গীর ওস্তাদ কেবল কি চেনই সরায়? দস্তার পাত, চায়ের বাক্স—কত জিনিস! এমনভাবে নিয়ে আসে যে—

হঠাৎ আমার হাসি এল। একটা প্রবল, অসহ্য হাসির উচ্ছ্বাস। চেষ্টা করেও আমি নিজেকে সামলাতে পারলুম না। জাহাঙ্গীর ওস্তাদ ভয়ানক চমকে উঠল—হাঁ করে তাকিয়ে রইল আমার দিকে।

হারুণ ধমক দিয়ে উঠল।

এই—এই—কী হচ্ছে!

আমি হাসতে হাসতে বললুম, আমাদের গ্রামে একটা ছিঁচকে চোর লোকের হাঁস চুরি করত। সে-ও এমনি করে পেটের মধ্যে হাঁস বেঁধে নিয়ে যেত। হা—হা—হা—

ছিঁচকে চোর! জাহাঙ্গীর ওস্তাদের মুখের চেহারা বেগুনে হয়ে গেল। বিশ্রী গলায় চিৎকার করে উঠল ঃ আভি নিকাল্ দো ইস্‌কো—ই বদ্‌মাস বুদ্ধুকো—ভাগো—গেট্ আউট্—

বেরিয়ে এসে হারুণ বললে, দূর শালা, করলি কী?

আমি তখনো হাসছি। এরই এত নামডাক—ওস্তাদ! আমাদের পাড়াগাঁয়ের চোরদের তো কেউ ওস্তাদ বলে না—তারাও তো এমন করে কত ঘটি-বাটি, কত জিনিসপত্র সরায়! তাদের তো কেউ বাহাদুরী দেয়না—তাদের নামে তো এমন করে ঢাক-ঢোল বাজায় না কেউ!

সেই পাগলটা তখনো হাসছে—দেওয়ালে ঠেস দিয়ে নিঃশব্দে হাসছে। হঠাৎ হাসি বন্ধ হয়ে গেল আমার। পাগলের মুখে মাছি বসছে—চোখের পাশ দিয়ে উঠে আসছে পিঁপড়ে। লোকটা মরে গেছে—দুনিয়ার ওপর শেষ হাসি হেসে নিয়ে বিদায় হয়েছে দুনিয়া থেকে।

হারুণের ওখান থেকে পালিয়েছি। খালি পকেট নিয়ে ঘুরছি পথে পথে। পেটে চিন্‌চিন করছে খিদে।

চেনা রেস্তোরাঁয় যাওয়া চলে। ওরা আমাদের ভয় করে—বাকীতেও নিশ্চয় দেবে। কিন্তু তখুনি সে লোভটাকে আমি সামলে নিলুম। বলা যায় না, দলের কারও সঙ্গে হয়তো দেখা হয়ে যাবে। কে বলতে পারে, মহবুব মিঞা কোথাও ঘাপটি মেরে বসে আছে কি না। তারপরে হয়তো আর ফিরতে পারব না। আবার যেতে হবে সেই জীবনে, সেই শিকারের চেষ্টায়, সেই ফুর্তির সঙ দেখতে! সেই মেয়েটা কবে মরে গেছে—সেখানে আর যেতে মন চায় না। নাঃ, অসম্ভব!

উঠে হাঁটতে হাঁটতে এলুম চৌরঙ্গীতে।

ঝকঝকে হোটেলে ঝলমলে আলো। খাবারের গন্ধ। খিদেটা মোচড় দিচ্ছে পেটের ভেতর। একজন মোটা মারোয়াড়ী গেল পাশ দিয়ে, মানিব্যাগটা দেখতে

পাচ্ছি পরিষ্কার। একবারের জন্যে হাত নিশপিশ করে উঠল। নাঃ—আর নয়।

কিন্তু খিদেটা সহ্য করা যাচ্ছে না। যেমন করে হোক কিছু খাওয়া দরকার।

দুজন সায়েব বেরুল হোটেল থেকে। এই সন্ধ্যেবেলাতেই মদে চুরচুর। শুনেছি, মদ খেলে ওদের মেজাজ খুলে যায়। আমাদের দলের একজন একবার একটা মাতাল সায়েবকে ট্যাক্সি ডেকে দিয়েছিল। গাড়িতে ওঠবার সময় সায়েব তার হাত থেকে সোনার ঘড়ি খুলে বকশিশ দিয়েছিল ওকে। ঘড়িটাকে লুকোবার জন্যে ও অনেক তাল করেছিল, কিন্তু মহবুব মিঞার চোখ এড়াতে পারে নি। ঘড়িটা কেড়ে তো নিলই, যা মার মেরেছিল সে আমার আজও মনে আছে।

হঠাৎ কী হল, আমি সায়েবদের কাছে গিয়ে হাত পাতলুম।

চার আনা পয়সা দাও না সায়েব, খাব।

আমার দিকে তাকিয়ে ওরা থমকে গেল।

ইউ নিগার! জোয়ান আড্‌মি ভিখ্‌ মাংগতা?

একবারের জন্যে আমার লজ্জা হল। মনে হল ছিঃ ছিঃ, সত্যিই আমি ভিক্ষে চাইছি ওদের কাছে! কিন্তু ভিক্ষে না চাইলেও আর একটা রাস্তা খোলা আছে সামনে। পকেট মারতে হবে। না, কিছুতেই নয়।

খেতে পাই না সায়েব।

নোক্‌রি কর, নোক্‌রি কর, ইউ নিগার।

নোক্‌রি মেলে না সায়েব।

(মিথ্যে কথা বললুম। চাকরির কথা আমি কখনও ভাবি নি। চাকরি যে কী করে করতে হয় তাও জানা নেই আমার।)

হুট! সায়েবরা এগোতে চেষ্টা করল।

আমার কেমন রোখ চেপে গেল। সামনে দাঁড়িয়ে পড়ে বললুম, কিছু দিয়ে যাও সায়েব, অন্ততঃ চার আনা পয়সা, খিদেয় পেট জ্বলে যাচ্ছে।

হট যাও হটো।

বলে হঠাৎ পা তুলল একজন। প্রচণ্ড একটা লাথি এসে পড়ল আমার পাঁজরায়।

আমি ঘুরে পড়ে গেলুম। কিন্তু চোটটা বেশী লাগে নি, তক্ষুনি উঠে

দাঁড়িয়েছি আমি। আর আমার হাসির যন্ত্রে তখন ঝঙ্কার উঠেছে, হাসিতে আমি ফেটে পড়ছি।

আশেপাশে লোকজন ছিল না; কিন্তু যে দু চারজন ছিল, তারা সব ঘুরে দাঁড়াল আমার দিকে। সায়েবদের চোখগুলোতেও আতঙ্ক আর বিস্ময়ের ছায়া।

ল্যাফিং!

হাসতে হাসতে আমি বললুম মারুন স্যার, আবার মারুন। কিন্তু চার আনা পয়সা আমাকে দিতেই হবে।

আর একটা লাথি পড়ল। গড়িয়ে গেলুম না, গিয়ে ধাক্কা খেলুম একটা গাড়িবারান্দার থামে। মাথাটা ঝনঝন করে উঠল, চোখের সামনে অন্ধকারের ঢেউটা আছড়ে পড়তে না পড়তে চৌরঙ্গীর একরাশ উজ্জ্বল আলোর মধ্যে মিলিয়ে গেল।

মুখে নোনা রক্তের স্বাদ। জিভ দিয়ে দাঁতের গোড়া থেকে রক্ত লেহন করতে করতে আমি হেসে বললুম, স্যার, চার আনা পয়সা—

এবার ওরা স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে গেল। অদ্ভুতভাবে চেয়ে রইল কিছুক্ষণ। তারপর একটা পাঁচ টাকার নোট উড়ে এল আমার দিকে।

চারদিকে তখন ভিড় জমবার উপক্রম। একটা পুলিসও যেন এগিয়ে আসছে দেখা গেল। আর দেরি করা নয়। নোটটা কুড়িয়ে নিয়ে আমি বললুম, স্যার, বহুৎ সেলাম।

তারপর ভিড়ের ভেতর দিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেলুম।

জাল নয়, আসল পাঁচ টাকার নোট।

একটা গলির মধ্যে দাঁড়িয়ে সেটাকে আমি পরীক্ষা করলুম। কি মনে হল, গন্ধ শুঁকেও দেখলুম একবার। পোড়া তামাকের গন্ধ জড়িয়ে আছে নোটের গায়ে।

শার্টের পকেটে ময়লা রুমালটা ছিল, সেটা দিয়ে মুখ মুছে ফেললুম। ঢুকে পড়লুম একটা মুসলমানী হোটেলে। পেট ভরে রুটি-মাংস খাওয়া গেল অনেকদিন পরে। জেলের খাবার খেয়ে শরীরে কিছু আর ছিল না।

আবারও যাব নাকি হারুণদের ওখানে? দূর কী হবে গিয়ে? যে ফাঁদ থেকে একবার বেরিয়ে এসেছি, আবার ঠেলে দেবে তারই ভেতরে। মহবুব মিঞার জায়গায় এসে দাঁড়াবে জুম্মা শেখ। আমি ওদের চিনে নিয়েছি।

সব এক রকম, কারও সঙ্গে কারোর কোন তফাত নেই।

তার চাইতে এই ভাল। লাথি খেয়ে আমি হাসতে পারি. অন্যকে খুশী করে বকশিশ পেতে পারি। এই তো বেশ। এই করেই চমৎকার চলে যাবে! শুধু লক্ষ্য করতে হবে, কখন সায়েবগুলো মাতাল হয়ে বেরিয়ে আসে হোটেল থেকে।

থাকার একটা আস্তানা খুঁজে নিতে হবে। আজকের জন্যে আমার ভাবনা নেই, শেয়ালদা কিংবা হাওড়া স্টেশনে গিয়ে মুখ গুঁজে পড়ে থাকব। পরে যেখানে হোক, ব্যবস্থা একটা হয়ে যাবেই।

রাস্তায় নেমে এসে এক বাক্স সিগারেট কিনলুম। একটা ধরিয়েছি, এমন সময় কে বলল, শোন।

ফিরে তাকালুম। সুটপরা মিশমিশে কালো একটা লম্বা লোক। এক নজরেই দেখলুম, চমৎকার স্বাস্থ্য। মাথায় কোঁকড়া কালো চুল, পুরু পুরু ঠোঁট। ঝকঝকে দাঁত বের করে সে হাসছে।

আমাকে বলছেন?

হ্যাঁ, তোমাকেই।

বলুন, কি বলবেন।

এখানে নয়, অন্য জায়গায় চল।

আমি চোখ কুঁচকে লক্ষ্য করলুম লোকটাকে। আর একজন মহবুব মিঞা। কিন্তু আর আমার ভয় নেই। এখন উনিশ বছর বয়স আমার। অনেক দেখেছি, অনেক শিখেছি। আজ আর সহজে আমার কিছু করতে পারবে না।

কোথায় যেতে হবে?

চল ওদিকের মাদ্রাজী হোটেলে। তোমাকে কফি খাওয়াব।

বাংলা বলছে বটে, কিন্তু বাঙালী নয়। এবার বোঝা গেল মাদ্রাজী। কিন্তু মাদ্রাজী? কলকাতা কোন্ পাড়ায় কোন্ পকেটমারদের আস্তানা, মোটামুটি তার সবই জানি। কোনও মাদ্রাজীর দল কোথাও আছে বলে তো শুনি নি।

বললুম, আমি এখুনি খেয়ে এসেছি। তা ছাড়া শুধু শুধু আমাকে কেন কফি খাওয়াবেন আপনি?

আবার কালো ঠোঁটের ভেতর থেকে আশ্চর্য উজ্জ্বল সাদা হাসি সে হাসল। বলল, কিচ্ছু ভেব না, আমি পুলিসের লোক নই।

পুলিসকে যেন আমি ভয় পাচ্ছিলুম! পুলিসের লোক নয় বলেই আমার ভয়।

বেশ, কফি না খাও, একটু গল্পই করবে আমার সঙ্গে।

না, লোকটা মহবুবের দলের কেউ নয়। এ হাসি আলাদা। এর চেহারা, এর পোশাক, এব কথা বলবার ধরন সম্পূর্ণ অন্য জাতের। মহবুবরা হলে আমি চিনতে পারতুম। ট্রামে বাসে পথে অচেনা পকেটমারকে দেখলেও আমরা যেমন সঙ্গে সঙ্গেই তাকে স্বজাতি বলে বুঝতে পারি।

আচ্ছা, চলুন।

একতলায় একটা ছোট মাদ্রাজী রেস্তোরাঁ। লোকটা ঢুকতেই রেস্তোরাঁর মালিক হেসে মাথা নাড়ল। বুঝলুম, ওকে চেনে, খাতিরও করে। ওদের ভাষায় কী বললে জানি না, তবে 'ম্যানেজার' কথাটা শুনতে পেলুম।

কোণা দেখে আমরা বসলুম। এক পেয়ালা কফি নিয়ে লোকটা বলল, তুমি বাঙালী?

হ্যাঁ, বাঙালী।

আশ্চর্য। (কথাটা বললে ঃ আচ্‌চড়্‌জো। কিন্তু ওর সব কথাগুলো কেমন শোনাচ্ছিল, তা বলে লাভ নেই। যা বলেছিল, তাই বলি।)

আশ্চর্য কেন?

তোমাব চেহারা। বাঙালী এমন অদ্ভুত দেখতে হয়, জানতুম না।

আমি হাসলুম। নিজের সম্বন্ধে ও-কথাটা এতবার আমি শুনেছি যে, আমারই বলতে ইচ্ছে করে ঃ আমার আগে এমন কখনও জন্মায় নি, আবার পরেও কোনদিন জন্মাবে না।

কফিটাতে আলগা একটা চুমুক দিয়ে লোকটা আবার বলল, তুমি কী কর?

কিছুই না।

কাজ কববে?

কিসেব কাজ? কোনও কাজ আমার জানা নেই।

লোকটা মিনিট খানেক আমার মুখেব দিকে চেয়ে রইল। কোঁকড়ানো চুলগুলো আলোয় চিক চিক করতে লাগল, ওর নেকটাইয়ের সোনালী সুতো-

গুলো জ্বলতে লাগল। একটু চুপ করে থেকে বলল, সার্কাসে কাজ করবে?

সার্কাসে?

আমি অবাক হয়ে গেলুম।

তোমাকে আমি দেখেছি। দেখেছি লাথি খেয়ে পড়ে গিয়েও তুমি হাসতে পার। লক্ষ্য করেছি খুব ভাল তোমার শরীর। কিন্তু গোরার লাথি খেয়ে ভিক্ষে কর কেন? অপমান হয় না?

অপমান কেন?

অপমান বইকি। অনেককাল ওরা লাথি মেরেছে আমাদের, এখন সে লাথি ফিরিয়ে দেওয়ার দিন।

লোকটার চোখ এইবার জ্বল জ্বল করে উঠল ঃ জান, এই নিয়ে ওরা নিজেদের দেশের কাগজে গল্প লেখে, দুনিয়াকে জানিয়ে দেয়, ইণ্ডিয়ানেরা কুকুরেরও অধম। আমি ওদের দেশে অনেক ঘুরেছি, আমি জানি। আবার একটু থেমে সে বললে, তুমি এস আমাদের সঙ্গে।

কোথায়?

ইণ্ডিয়ান কণ্টিনেণ্টাল্ সার্কাসের নাম শুনেছ?

ঠিক মনে নেই।

দু বছর আগে আমরা ক্রিস্‌মাসে কলকাতায় এসেছিলুম। সার্কাস দেখিয়েছি কলকাতা ময়দানে। আমি সেই সার্কাসের ম্যানেজার।

কিন্তু সার্কাসে গিয়ে আমি কী করব?

সবাই যা করে। খেলা দেখাবে। তার চাইতে আরও ভাল কাজ হবে তোমাকে দিয়ে। আমাদের একজন ওস্তাদ ক্লাউন দরকার। ক্লাউন জান?

আমি চমকে উঠলুম। বললুম, হ্যাঁ জানি। তারা হাসায়।

ঠিক। তারা না হাসালে একঘেয়ে হয়ে যায়, সার্কাস জমে না। আর সব চাইতে ভাল ক্লাউন হচ্ছে সে-ই, যে ওস্তাদ খেলোয়াড়। খেলতে পারে, খেলতে খেলতে আছাড় খেতে পারে, আছাড় খেয়ে হাসতে পারে, লোককে হাসাতে পারে।

আমি পারব?

তুমিই পারবে।

কিছুক্ষণ চুপ করে রইলুম। নিজের জীবনের অর্থটা যেন এখন পরিষ্কার হচ্ছে আমার কাছে। এই কি আমি চেয়েছিলুম? এরই জন্যে কি দিনের

পর দিন প্রস্তুতি চলছিল আমার ভেতর? এই কি আমার জন্মনক্ষত্রের সংকেত?

আস্তে আস্তে বললুম, আচ্ছা, আমি রাজী।

কফির পেয়ালা, নামিয়ে রেখে আমার কাঁধে হাত রাখল ম্যানেজার। বলল, ভারী খুশী হলুম। আমি দেখিয়ে দোব, গোরার লাথি খাওয়ার চাইতেও আরও বড় কাজ তুমি করতে পার।

মনে হল, ঠিক সেই সময় রাস্তায় কে হেসে উঠল হা-হা করে। চমকে গলা বাড়িয়ে দেখলুম, একটা পাগল। সেই মরা লোকটা নয়তো? না—এ আর একজন। গলায় ছেঁড়া জুতোর মালা, মাথায় ভাঙা একটা শোলা-হ্যাট। ঠিক ক্লাউনেব পোশাক।

॥ ছয় ॥

মস্ত বড় দল ইণ্ডো কণ্টিনেণ্টাল্ সার্কাস।

মাদ্রাজে ঘাঁটি। মালিক, ম্যানেজার ছাড়াও দলের অধিকাংশই মাদ্রাজী। তা ছাড়া একটি জাপানী পরিবার আছে, স্বামী-স্ত্রী, সাত বছরের একটি বাচ্চা। একজন আর্মেনিয়ান, একজন জার্মান, তিনজন পাঞ্জাবী, একজন বাঙালী।

মনে আছে, ম্যানেজারের সঙ্গে প্রথম যেদিন গিয়ে পেঁছিলুম, সেদিন মেয়েরা আমার চারদিকে এসে ভিড় করে দাঁড়িয়েছিল। তারপর সে কী হাসি।

চোখ লাল করে কি একটা ধমক দিল ম্যানেজার। হাসতে হাসতেই ছুটে পালালো তারা।

পরে শুনেছিলুম তারা জানতে চেয়েছিল, এটা কী জানোয়ার? কোথায় পাওয়া গেল একে?

কিন্তু আমি অবাক হয়ে তাকিয়ে দেখছিলুম চারদিকে। ঘোড়াগুলোকে দু-তিনটে চাকর দলাই-মলাই করছে। একজন একটা জলের পাইপ দিয়ে স্নান করাচ্ছে হাতিকে। খাঁচার মধ্যে ঘুমুচ্ছে সিংহেরা, বাঘেরা চুপচাপ বসে আছে। একটা আবার হাই তুলল। পাখিরা চিৎকার করছে, দৌড়ো-দৌড়ি করছে কুকুরগুলো।

হাসতে হাসতে দুটি মেয়ে ছুটে গিয়ে রিং ধরে দুলতে আরম্ভ করল। দুজন পুরুষ প্যারালাল বারে কসরত করছিল।

একজন হঠাৎ এগিয়ে এল আমার দিকে। তারপর আমি ভাল করে কিছু বোঝবার আগেই লোহার মত দু হাতে আমাকে ধরে তুলে সে শূন্যে ছুঁড়ে দল।

এ অভিজ্ঞতা নতুন। আমি চেঁচিয়ে উঠলুম। তারপর সোজা গিয়ে

তিন চার হাত উঁচু একটা জালের ওপর গিয়ে আছড়ে পড়লুম। উঠে দাঁড়াতেই দুলে উঠল জালটা। টাল সামলাতে না পেরে আবার পড়ে গেলুম জালের ওপর।

আবার হাসির ঝড় উঠল। দেখলুম এবার ম্যানেজারও হাসছে। কি মনে হল জানি না—আমিও হেসে উঠলুম সেই অবস্থাতেই।

সার্কাসের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়ে গেল।

দলের বাঙালীটির সঙ্গেও সেই দিনই আলাপ হয়ে গিয়েছিল। তখন সন্ধ্যা হয়ে গেছে, মেয়েরা বেরিয়েছে দল বেঁধে। চাকর-বাকরেরা ঝাড়পোঁছ করছে সব। পুরুষদেরও বিশেষ দেখা নেই, তারাও কে কোন্ দিকে বেরিয়েছে। শুধু বুড়ো আর্মেনিয়ান সাহেবটা একমনে ডন-বৈঠক দিয়ে চলেছে। পরে জেনেছিলুম ও বুকের ওপর হাতি নেয়। আর এক কোণে চুপচাপ বসে জাপানী লোকটি নিজের মনে কী একটা তারের যন্ত্র বাজিয়ে চলেছে।

আমি ওর বাজনা শুনছিলুম। কী বাজাচ্ছে জানি না- অমন সুর আমি কোনদিন শুনি নি। তবু মনে হচ্ছিল, আমি যেন পিসিমার কাছে ফিরে গেছি। আমাদের বাড়িটার চুণ-বালি-খসা দেওয়ালে ইঁটগুলো মুখ বের করে আছে, তার উপরে প্রদীপের আলো কাঁপছে, কারা যেন সার দিয়ে বসে আছে দেওয়াল ঘেঁষে। পিসিমা পড়ছে রামায়ণের পালা—অশোক-বনে সীতা বসে বসে কাঁদছেন আর রাবণ এসে তাঁকে ভয় দেখাচ্ছে। চৈত্র মাসের গরম হাওয়া এখনও ঠান্ডা হয় নি, আমাদের বাগান থেকে বয়ে আনছে চাঁপাফুলের গন্ধের ঝলক। অন্ধকার উঠোন দিয়ে একটা সজারু চলে গেল। তার কাঁটার ঝমঝমানি শুনতে পেলুম।

ওর বাজনার ভেতর দিয়ে যেন সেই চাঁপাফুলের গন্ধ আসছিল। যেন শুনতে পাচ্ছিলুম পিসিমার রামায়ণ পড়ার সুর, দেখছিলুম হাতের কোণা দিয়ে মধ্যে মধ্যে চোখ মুছে ফেলছে। আমার বুকের ভেতরটা কেমন দুলে উঠল। হাসি নয়—কী যেন আর একটা জিনিস, ঠিক বুঝতে পারি না।

এমনি আর একদিন হয়েছিল জেলখানায়। সেও ফাল্গুন-চৈত্র মাস হবে। হঠাৎ দেখেছিলুম একটা আমগাছ সোনা রঙের রাশি রাশি মুকুলে ছেয়ে গেছে।

আমার মনে পড়েছিল আনন্দকে। ইস্কুলের টিফিনের ঘণ্টায় এমনি একটা

আমগাছের নীচে বসেছিলুম আমরা। হাওয়ায় ঝুরঝুর করে পড়ছিল মুকুলের কণা, শুকনো পাতায় মধু পড়ছিল, টুপটুপিয়ে, ক্ষুদে মৌমাছিরা উড়ে বেড়াচ্ছিল ক্ষ্যাপার মত। আনন্দ আর আমি তালের পাটালি দিয়ে মুড়ি খাচ্ছিলুম। হঠাৎ চিবনো বন্ধ করে আনন্দ বলছিল, জানিস মেজদির বিয়ে হয়ে গেল। চলে গেল শ্বশুরবাড়িতে। ওকে ছেড়ে আমি একদিনও থাকতে পারি না—ভারি কষ্ট হচ্ছে আমার।

সেদিন জেলখানাতেও মুকুলভরা আমগাছটার দিকে তাকিয়ে এই রকম কষ্ট হয়েছিল আমার। আনন্দকে মনে পড়ছিল। ওকি এখনো ছবি আঁকে? আর পিসিমা? কে তাঁকে মহাভারত পড়ে শোনায়?

আমি বাজনাটা শুনছিলুম। কখন সেটা থেমে গেছে টের পাই নি। এই সময় ডেকে উঠল হাতিটা, আমার চমক ভেঙে গেল।

পাশে একজন লোক এসে দাঁড়িয়েছে।

মাথার চুলগুলো ছুঁচের মত খাড়া। ভুরুর ওপর কয়েকটা শুকনো দাগ—কিসে যেন আঁচড়ে দিয়েছে মনে হয়। লোহা দিয়ে পেটা কালো শরীর। পরনে পাজামা আর হাফ-শার্ট।

লোকটাকে বিকেলবেলায় আমি দেখেছি, একটা মোটর সাইকেল নিয়ে ভট্ ভট্ আওয়াজ তুলে তাঁবুটার চারদিকে ঘুরপাক খাচ্ছিল।

লোকটা এসে আমার সামনেই একটা কাঠের টুলে বসে পড়ল। পরিষ্কার মোটা গলায় জিজ্ঞেস করল, তুমি বাঙালী?

উচ্চারণ বাঙালে—ম্যানেজারের মত নয়। আমি বাঙালে ঢঙ শুনলে বুঝতে পারি। মহবুবের দলেই কয়েকজন ছিল।

বললুম, হ্যাঁ, আমি বাঙালী।

নাম কী?

একবারের জন্যে ভাবলুম, কী বলব। মহবুব আমাকে যে নাম দিয়েছিল সেইটে? কিন্তু ও-নাম আমি মুছে ফেলে দিয়েছি, ওই পাঁচ বছরের মধ্যে আর আমি ফিরে যেতে চাই না।

একটু চুপ করে থেকে বললুম, মুরারি ভট্টাচার্য।

বলতেই চমকে উঠলুম। নিজের কানেই এমন আশ্চর্য শোনাল যে কী বলব। হঠাৎ মনে হল যেন একটা মরা লোকের নাম বলছি—নিমতলার শ্মশানে কাঠকয়লা দিয়ে বড় বড় হরফে লেখা যেমন একটা নাম দেখেছিলুম।

লোকটা বলল, ব্রাহ্মণ? দেশ কোথায়?

আমি জবাব দিলুম না।

ও, বাড়ি থেকে পালিয়ে এসেছ? তা এখানে মরতে কেন? আর জায়গা জুটল না?

এবারেও চুপ করে রইলুম। মনে পড়ে গেল, মহবুব মিঞার আস্তানায় যেদিন প্রথম এসেছিলুম, সেদিন বড় ছেলেটাও আমাকে ঠিক এই কথাটাই জিজ্ঞেস করেছিল।

আমি ভাবতে চেষ্টা করলুম, পৃথিবীতে আমার আসল জায়গা কোন্‌টা—কোন্‌খানে গেলে আমাকে মানাতো।

লোকটা আবার বলল, চাটগাঁ গেছ কখনও? পাহাড়তলী?

না।

সেইখানেই আমার বাড়ি। আমার নাম হরেন দাস। কিন্তু বাঙালী বলেই আসল নামটা তোমাকে বললুম এতদিন পরে। —একটু চুপ করে থেকে বললে ঃ

এরা জানে, আমার নাম মোহন পাণ্ডে। তুমি এদের বলো না।

নাম লুকিয়েছেন কেন?

তখনই জবাব দিল না হরেন দাস। জাপানী আবার তার তারের বাজনায় একটা নতুন সুর বাজাচ্ছে। কিছুক্ষণ দুজনেই শুনতে লাগলুম। হরেন দাসও বোধ হয় বাড়ির কথা ভাবছিল।

সে অনেক কথা। আর একদিন বলব।

দেশে যান না বুঝি?

যাওয়ার উপায় নেই। একটা দীর্ঘনিশ্বাস পড়ল হরেন দাসের।

কিন্তু এ সার্কাস যদি কখনও চাটগাঁয় যায়!

গিয়েছিল বছর চারেক আগে একবার। আমি যাই নি। তার আগেই ছুটি নিয়ে চলে গেলুম।

আমি ভাবতে চেষ্টা করলুম—হরেন দাসও কি আমার মত কোনও সেকেণ্ড মাস্টারকে মেরে পালিয়ে এসেছে? সঙ্গে সঙ্গেই মনে হল আমাদের গ্রামে কখনও সার্কাস যায় না। আমার কোনও ভাবনা নেই।

হরেন দাস আবার কী বলতে যাচ্ছিল কিন্তু থেমে গেল। হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে বলল, আচ্ছা, পরে কথা হবে তোমার সঙ্গে।

আমি সার্কাসে শিক্ষানবিসী আরম্ভ করলুম।

সার্কাসের দলের বসে থাকবার জো নেই। আজ এখানে, কাল ওখানে। ম্যানেজারের সঙ্গে যেদিন আমি গিয়ে পেঁৗছেছি, তার দুদিন পরেই কাশ্মীরে রওনা হলুম আমরা।

কাশ্মীরে এক মাস। সেখানে শীত নামল, নেমে এলুম লাহোরে। লাহোর থেকে দিল্লী।

এক নিঃশ্বাসে ছ মাসের কথা বলে গেছি। এর মধ্যে আমার কথা বলা হয় নি।

কাশ্মীরে আমার কিছু করবার ছিল না। শুধু সার্কাসের সময় চাকরদের সঙ্গে জিনিসপত্র টানাটানি করতুম। জাল নিয়ে আসতুম, বার সরিয়ে দিতুম, রোপ-ট্রিকের দড়ি খাটিয়ে দিতুম, বল কিংবা রেকাবির খেলা শেষ হয়ে গেলে সেগুলো কুড়িয়ে নিয়ে যেতুম ভেতরে। আর ওরই মধ্যে আমি লক্ষ্য করে-ছিলুম, আমি ক্লাউন নই—তবু আমাকে দেখলেই একটা হাসির ঢেউ উঠত গ্যালারিতে।

একদিন ম্যানেজারকে বলেছিলুম, আমাকে নামতে দাও একবার। ওদেব চাইতে ভাল হাসাতে পারব আমি।

ম্যানেজার পিঠ চাপড়ে বলেছিল, পারবে বইকি। সেই জন্যেই তো তোমাকে নিয়ে এসেছি। কিন্তু এত তাড়াতাড়ি কেন? আগে সব শিখে নাও—তারপরে হবে।

শেখাও চলছিল।

সেই ভোর চারটেয় ওঠা। সারা শ্রীনগর শহর যখন কুয়াশায় ঢাকা, পাহাড়ের উপর-নীচে আশেপাশে আলোগুলো যখন মিটি মিটি, শীত আর কনকনে হাওয়ায় রক্ত যখন জমে উঠতে চায়—তখনই আমাদের কাজ শুরু হত।

প্রথম প্রথম টেনে তুলত ম্যানেজার। একদিন উঠতে চাই নি, এক ঝটকায় আমাকে আছড়ে ফেলল মাটিতে। তারপর গালে বসিয়ে দিল একটা প্রকাণ্ড চড়।

তৎক্ষণাৎ আমি হেসে উঠলুম। আর হাসির দমকে দমকে আমার শিরায় শিরায় রক্ত ছুটে গেল। তার পরেই বুঝলুম, হাসির জন্য আমার আর ভাবনা নেই; এখানে সব নিয়মে চলে, কাঁটায় কাঁটায়। একটু এদিক থেকে ওদিক

হলে আর কথা নেই। চড়-চাপড় তো তুচ্ছ, যে প্রকাণ্ড লম্বা চাবুকটা নিয়ে ম্যানেজার সিংহের খেলা দেখায়—তারও ঘা মুখে-পিঠে এসে পড়ে।

আর বাঁধা একটা গালাগাল আছে তার ঃ বাঁদী কী বাচ্চা।

তিনদিন যেতে না যেতেই আমার অভ্যাস হয়ে গেল। ঠিক চারটে বাজতে না বাজতেই ছুটে আসতুম বড় তাঁবুটার মাঝখানে। আলোয় আলোয় তাঁবু ঝলমল করে উঠেছে দিনের মত, শুধু গ্যালারিতে লোক ছাড়া আর সবই আছে। তারই মাঝখানে চলেছে কসরত।

জাপানী জোশিদোর বাচ্চা ছেলে বুশিদো পিকক্ হচ্ছে। তার মা ওকুমা একটা বোর্ডের গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে নিথর হয়ে, আর জোশিদো একটার পর একটা ছোরা ছুঁড়ে দিয়ে তার শরীরের দু পাশে সাজিয়ে দিচ্ছে ফ্রেমের মত। এই খেলাটা দেখতে প্রথম প্রথম ভয়ে বুজে আসত চোখ, মনে হত, একটা যদি একটুখানিও ফসকে যায় তা হলে আর দেখতে হবে না। কিন্তু একটাও ভুল হত না। আর সেদিকে না তাকিয়েই নিশ্চিন্তে নানা রকম ফিগার করে যেত বুশিদো—যেন রবারের পুতুলের মত। শরীরটাকে যেমন খুশী ভেঙে-চুরে যা ইচ্ছে তাই করত।

এক মনে পাঁচ সাত শো ডন-বৈঠক ছিয়ে যেত বুড়ো আর্মানী ম্যাথু। এই বুড়ো বয়সেও কী তার চেহারা—যেন লোহা দিয়ে পাঁজরাগুলো তৈরি করা। মুথুস্বামী আর সুব্বারাও নানা কসরত করত বারের ওপর, চিন্নু রিংয়ের খেলা করত আর ট্র্যাপিজে উঠত; পাঞ্জাবী হরদেও আর নটরাজন্ এ ওর মাথায় উঠে নানা ধরণের ফিগার করত।

এক-একদিন লোহার মস্ত বড় খাঁচাটা টেনে আনা হত মোটর সাইকেল নিয়ে তার মধ্যে ঘুরতে আরম্ভ করত হরেন দাস, শেষে আর তাকে দেখা যেত না, মনে হত একটা ঘূর্ণি ঘুরছে।

আর আসত মেয়েরা।

রুক্মিনী পদ্মা, রাধা, অনসূয়া, রত্নাবলী। রুক্মিনী মুথুস্বামীর স্ত্রী, রত্নাবলী নটরাজনের বোন। পদ্মাই ছিল সব চাইতে ছোট আর সব চাইতে সুন্দরী।

মনে আছে, আমাকে দেখে পদ্মাই সব চাইতে বেশী হেসেছিল প্রথম দিন।

পদ্মা উঠত ফ্লাইং ট্র্যাপিজে। আর এই খেলাটাই আমার সব চাইতে রোমাঞ্চকর মনে হত। মাথার উপর দুলছে ট্র্যাপিজ, সেই ট্র্যাপিজে ঝড়ের

মত দুলছে পদ্মা। নিখুঁত শরীর, নিটোল বুক—পদ্মাকে দেখে মনে হত যেন পাথর কুঁদে কুঁদে গড়া।

তারপর সেই ভয়ঙ্কর মুহূর্ত।

হঠাৎ দুলতে দুলতে সে প্রচণ্ড বেগে এক দিকের ট্র্যাপিজ থেকে ছিটকে বেরিয়ে যেত তীরের মত। আমার যেন নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে যেত। যদি ছাড়িয়ে বেরিয়ে যায়, তা হলে কত দূরে গিয়ে যে আছড়ে পড়বে ঠিক নেই! সমস্ত শরীরটা ওর মুহূর্তে গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে যাবে। কিন্তু কিছুই হত না, একেবারে নির্ভুল ভাবে সে ওপাশের ট্রাপিজের উপরে গিয়ে পড়ত। একবার দোল খেয়েই সোজা উঠে দাঁড়াত দড়ি ধরে। হাসিতে ঝলমল করত মুখ।

আমি স্তম্ভিত চোখে তাকিয়ে থাকতুম সেদিকে। আর তখনই হযত একটা চড় পড়ত গালে।

হাঁ করে ওদিকে কী দেখছিস বাঁদী কী বাচ্চা। নিজের কাজ কর্।

বলেছি, অদ্ভুত চেহরার সঙ্গে অদ্ভুত স্বাস্থ্য নিয়ে জন্মেছিলুম আমি। দশ বছর বয়সে ষোল বছরের জোর ছিল আমার গায়ে। উনিশ বছরে পা দিয়ে আমি পঁচিশ বছরের জোয়ান হয়ে উঠেছিলুম। মানুষ পাচ আঙুলে যা ধরে ছ আঙুলে তার চাইতে আমি অনেক বেশী আঁকড়ে ধরতে পারতুম।

রুটি-মাংস-ডিম-ফলমূল খাওয়া, নিয়মিত ব্যায়াম ঘড়ি ধরা কাজ। আমার ভয়ঙ্কর শরীর আরও ভয়ঙ্কর হয়ে উঠল। কাশ্মীর থেকে যখন আমরা লাহোরে এসেছি, তখনই আমি তৈরি হয়ে গেছি অনেকখানি। তৈরি না হয়ে উপায় ছিল না। ম্যানেজার আমাকে ভালবাসত, হঠাৎ একটা কাজে কলকাতায় গিয়ে সে আমকে কুড়িয়ে এনেছিল—হয়তে সে জন্যে আমার ওপর তার যেন দায়িত্বও জন্মেছিল খানিকটা। কিন্তু কাজে গাফিলতি হলে তার কাছে কোন ক্ষমা ছিল না।

একটু ভুল হলেই চড় পড়ত গালে। সঙ্গে সঙ্গে আমি হি-হি করে হেসে উঠতুম। আর ম্যানেজার মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে থাকত আমার দিকে। তার দু চোখ যেন বলত ঃ সাবাস সাবাস!

শুধু চাকরগুলোর অসহ্য ঠেকত। ওদের মধ্যে থেকেও আমি ওদের ছাড়িয়ে যাচ্ছি। নানারকম ভাবে আমাকে বিরক্ত করবার চেষ্টা করত যখন-তখন।

যেখানে আমাদের তাঁবু পড়েছিল, সেখানে মস্তবড় চৌবাচ্চা ছিল একটা। ঠাণ্ডা কনকনে জল জমে থাকত তাতে। জানোয়ারদের জন্যে দরকার হত, আমাদের কাজে লাগত। একদিন সকালে এসে বসেছি সেই চৌবাচ্চার ওপর। হঠাৎ পাশ থেকে একটা ধাক্কা লাগল আচমকা। আমি ঝপাং করে সেই হিম-শীতল জলের মধ্যে উলটে পড়লুম।

আঁকুপাঁকু করে উঠে দাঁড়াতেই দেখি বিঠু বলে একটা চাকর পরম আনন্দে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাসছে।

দাঁতগুলো ঠকঠক করে কাঁপছিল। সারা শরীরে অসহ্য হাসির উল্লাস। সেই উল্লাসেই আমি বিঠুর ওপরে লাফিয়ে পড়লুম।

বিঠু হয়তো এতটা ভাবতে পারে নি; হয়তো আন্দাজ করতে পারে নি আজকের উনিশ বছরের শরীরে আমার কী শক্তি—হাসির নেশা লাগলে সে শক্তি কী বুনো, কী ভয়ংকর হয়ে ওঠে।

দু হাতের বারোটা আঙুল লোহার আংটার মত আঁকড়ে ধরলুম ওকে। আমার মুখে ও একটা ঘুষি মারতে চেষ্টা করল, আমার হাসিটা তাতে আরও উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল। আমি ওকে দু হাতে ওপরে তুলে ধরলুম, তারপর চৌবাচ্চার মধ্যে ছুঁড়ে ফেলে দিলুম।

বিঠু মাথা তুলেই আমাকে কুৎসিত গাল দিতে শুরু করে দিল। এই এক মাসের মধ্যে হবেক ভাষার গালাগাল আমি খানিকটা বুঝতে শিখেছি। বিঠু চৌবাচ্চা থেকে উঠে পড়বার আগেই জলের মধ্যে আবার আমি ওকে চেপে ধরলুম।

বিঠু ছটফট করতে লাগল। সেই উগ্র হাসির উত্তেজনায় হয়তো সেদিন বিঠুর হাসি চিরদিনের মতই শেষ হয়ে যেত। কিন্তু ঠিক সেই সময় কোথা থেকে এল মুথুস্বামী। এক ঝটকায় আমাকে দূরে ফেলে দিয়ে বিঠুকে টেনে তুলল। বিঠু তখন খাবি খাচ্ছে।

মানেজারের কাছে খবর গেল।

ম্যানেজার এল সেই প্রকাণ্ড লম্বা চাবুকটা হাতে করে। দু চোখে তার আগুন ঝরছে। আমার দিকে তাকিয়ে দাঁতে দাঁত ঘষে বলল, বাঁদী কী বাচ্চা।

চাবুক খাওয়ার জন্যে আমি তৈরি হচ্ছিলুম। মারকে আমার ভয় নেই। হাসির ঘোর আমার তখনও কাটে নি। মুথুস্বামী টেনে তোলবার পর বিঠুর মুখের চেহারা আমি কিছুতেই ভুলতে পারছিলুম না।

ম্যানেজারের হাতের চাবুকটা বাতাসে শব্দ তোলবার আগেই রুক্মিনী এসে হাজির হল। বিঠুকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে ফর্ ফর্ করে ওদের ভাষায় কী বলে গেল খানিকটা। বোঝা গেল, আগাগোড়া ব্যাপারটা সে দেখেছে, আসল দোষ আমার নয়।

বিঠু কী বলতে গেল, তার আগেই ম্যানেজারের চাবুক পড়ল তার গায়ে। তড়াং করে লাফিয়ে উঠল বিঠু আর এক ঘা পড়তেই কেঁদে ফেলল হাউ-মাউ করে।

আর তার সেই কান্না দেখে আমাব হাসি আবার হাজারখানা হয়ে ভেঙে পড়ল। চোখ লাল করে এবার ম্যানেজার চাবুকটা তুলল আমার দিকেই। বলল, ভাগ বাঁদী কী বাচ্চা—

আমি ছুটে পালিয়ে এলুম। কিন্তু সেই থেকে আমার পেছনে লাগা ওদের বন্ধ হয়ে গেল।

আমরা লাহোরে নেমে এলুম। সেখান থেকে অমৃতসর জলন্ধর হয়ে দিল্লী।

চারটে মাস পেরিয়ে গেল।

এর ভেতরেই অনেকখানি এগিয়েছি আমি। প্যারালাল বারের নানারকম কসরত করতে পারি। জার্মান সায়েব হফম্যান সেই যে মস্ত সাইকেলটা নিয়ে অনেক রকম খেলা দেখায়, তারও কিছু কিছু শিখে নিয়েছি।

হফম্যান বলে, লেগে থাকলে পাকা খেলোযাড় হতে পাববে।

ম্যানেজার বলে, খেলোয়াড়ের চাইতেও বড খেলোয়াড কবব ওকে। ও হবে আমাব পয়লা নম্বরেব ক্লাউন। এমন ক্লাউন কোনও সার্কাস কোনদিন দেখে নি।

কিন্তু ক্লাউন হওয়াব চাইতেও আমার মনে আরও বেশী আকর্ষণ জাগায় ফ্লায়িং ট্র্যাপিজ। ট্রাপিজে খেলে পদ্মা। যখন মহাশূন্যে সে দুলতে থাকে, তার নিখুঁত নিটোল শরীরটা যখন তীরের মত উড়ে যায় মাথার ওপর দিয়ে, তখন আমার মাথার মধ্যে রক্ত ছল্‌কে পড়ে। যখন হাত ছেড়ে দিয়ে সে ছিটকে চলে আসে আর চিনু তাকে লুফে নেয়, তখন চিনুর সঙ্গে আমার ভাগ্য বদল করতে ইচ্ছে করে।

সার্কাস শেষ হয়ে গেলে এক একদিন যখন রাত্রে শুয়ে পড়ি অথচ ঘুম আসে না, তখন শুনতে পাই জোশিদো সেই বাজনাটা বাজাচ্ছে। সেই আশ্চর্য সুর—যা শুনলে আমার পিসিমাকে মনে পড়ে, মনে পড়ে বাগান

থেকে উঠে-আসা কাঁঠালি-চাঁপার গন্ধ—ঘরের ইট-বের-করা দেওয়ালের ওপর আলো-ছায়ায় যেন রামলীলার ছায়াবাজি। মনে পড়ে আনন্দকে—তার ছবিকে। এখন কিন্তু কেবল আনন্দ আর পিসিমায় এসে মন জুড়ে থাকে না; কখনো কখনো যেন দেখতে পাই, ট্রাপিজে দুলতে দুলতে হঠাৎ ফসকে নীচে পড়ে যাচ্ছে পদ্মা—আমি দু হাত বাড়িয়ে তাকে ধরে নেবার জন্যে অপেক্ষা করে আছি।

আর এক-আধদিন কানে আসে হরেন দাসের গান।

কোথায় লাহোর অমৃতসর, কোথায় চাটগাঁ! সার্কাস-পার্টির তাঁবুর ভেতরে রাত জেগে মোটর-সাইক্লিস্ট মোহন পাণ্ডে কোন্ দূর কর্ণফুলীর গান গায়ঃ

কর্ণফুলীর স্রোতে ভাইস্যা
চলে বন্ধুর নাও —
কুচবরণ কইন্যা ডাকে
বন্ধু ফিরয়া চাও রে—বন্ধু ফিরয়া চাও।

বাঙালে ভাষা ভাল বুঝতে পারি না, কিন্তু এ গানটার ভেতর থেকে কী যেন আমার মনে ছড়িয়ে পড়ে। একটা ছবি ভাসতে থাকে চোখের সামনে। হরেন দাস গেয়ে চলে ঃ

আব কত দূর যাও বে পরাণ
সামনে সমুদ্দুর,
নিতল জলের উথাল্-পাথাল্
কাল-নাগিনীব পুর।
তোমার লাইগ্যা রইতাম বইস্যা--
কোথায় তুমি যাও--
সোনার নাইয়া সোনার বন্ধু,
চাও রে ফিরয়া চাও!—

শুনতে শুনতে আমার ঘুম আসে। স্বপ্নের ঘোরে দেখি, আমাদের বাগানে গাছ আলো করে কাঁঠালি-চাঁপা ফুটেছে, দুপুরের হাওয়ায় দুলছে তারা। তারপর দেখি আনন্দকে; ঘাস-পাতা ফুলের বোঁটা দিয়ে ছবি আঁকছে—কত পাখি—ফুল, নদী, আকাশ। সব ছবিগুলোকে রাশি রাশি চাঁপাফুল মনে হয়। তারও পরে ওরা একসঙ্গে মিলে একটা যেন ট্র্যাপিজ হয়ে যায়, অনেক-

গুলো চাঁপাফুল মিলিয়ে গিয়ে একখানা মুখ হয়ে দোল খায়, আর সেই মুখখানা—

সব এলোমেলো, সব ছেঁড়া-ছেঁড়া। একরাশ জটপাকানো সুতোর মত একাকার হয়ে যায়।

॥ সাত ॥

ক্লাউন হয়ে নামলুম এক বছর পরে। পাটনাতে।

আরও তিনজন ছিল। তাদের জন দুই অল্প-বিস্তর খেলাও দেখাত, আর ক্লাউন হযেও নামত। এই এক বছরে দেখেছি, তাদের হাসাবার উপকরণ সামান্যই। আরো দশটা সার্কাসের ক্লাউন যা নিয়ে ভাঁড়ামো করে, তার বেশি কিছু ওদের ভাঁড়েও নেই। সেই টিনের ক্যামেরা নিয়ে ছবি তোলা. চোখের কোণে সরু পাইপ লাগিয়ে চোখের জলের ঝরনা ঝরানো, খেলোয়াড়দের নকল দেখাতে গিয়ে উল্‌টে-পাল্‌টে আছাড় খাওয়া।

আর সেই একই ধরনের হাসির কথা। একই রসিকতা।

দড়ির খেলা চলেছে। জাপানী ছাতা হাতে করে হেঁটে চলেছে মুন্নি। অমনি রসিকতা শুরু হল।

একজন বলল, নিচামে মিট্টি--

আর একজন বলল, মিট্টিকা উপর ডোরি—

প্রথম জন বলল, ডোরিকা উপর লড়কি—

লড়কি কি উপর তাম্বু—

তম্বুকা উপর বাম্বু—

উস্ কি উপর?

বুদ্ধু। তো বুদ্ধু চড়্ যা—

বলেই প্রথমটি দ্বিতীয়টিকে একটা লাথি মারল। দ্বিতীয় জন তাকে তাড়া করতে গিয়ে ধপাস করে একটা আছাড় খেল। এসব লোকের কাছে অনেক পুরনো হয়ে গেছে, নেহাৎ মেয়েরা আর ছোট বাচ্চারা ছাড়া আর কারুর হাসি পায় না।

ম্যানেজার আমাকে বলেছিল, নয়া নয়া আচ্ছা খেলা দেখ্‌লানো চাই বাচ্চু।

তাক লাগিয়ে দেওয়া চাই সকলকে।

বলতে ভুলেছি, আমার নাম বদল হয়েছে আবার। মুরারি ভট্টাচার্য সার্কাসে অচল। আমি বাচ্চু।

তাক লাগিয়েছিলুম প্রথম দিনেই।

আমার চেহারাই যথেষ্ট। তার ওপরে রঙ মেখে আরও সেজেগুজে যখন দেখা দিলুম তখন আমাকে দেখেই চারদিকে হাসির ঝড় উঠল। এমন কি প্যারালাল বারের উপর থেকে অবাক হয়ে গম্ভীর সুব্বারাও পর্যন্ত কিছুক্ষণ চেয়ে দেখল আমাকে।

ব্যাঙের মত চার পায়ে লাফাতে লাফাতে ঢুকেছি। সেই অবস্থায় চট্ করে আর এক ক্লাউন রামাইয়া আমার পিঠে চেপে বসল। বলল, চল বাচ্চা আরবী ঘোড়া—জলদি চল—

ঘোড়াকো চাট্ খাও গে?

বলেই এক ধাক্কায় আমি ছিটকে দিলুম রামাইয়াকে। রামাইয়া গিয়ে পড়ল ঝুলন্ত সুব্বারাওয়ের পায়ের কাছে। লাথির ঘায়ে সুব্বারাও তাকে আরও তিন হাত দূরে পাঠিয়ে দিল।

রামাইয়া উঠে দাঁড়াল। চাপা-গলায় বলল, শালা!

সুব্বারাওয়ের খেলা শেষ হলে আমি বারে গিয়ে উঠলুম। কয়েকটা ফিগার দেখিয়ে এক পায়ে দাঁড়িয়ে গেলুম বারেব ওপর। বললুম, আব্ দেখিয়ে দিল্লীওয়ালী মোতিজানকি নাচ্না—

গ্যালারী থেকে অট্টহাসি আর হাততালি ঝড়ের মত ছুটে এল আমার দিকে। নানা ভঙ্গীতে নাচের কসরত করছিলুম আমি। তারপর চারদিকের আলো আর হাসি আমার মাথার ভেতরে তুফান তুলল। কি করছি না করছি আর খেয়াল রইল না।

তখন আমার পা পিছলে গেল। পড়ে গেলুম মাটিতে। আর পড়বার সময় বারের প্রচণ্ড ঘা লাগল আমার পাঁজরাতে।

যন্ত্রণায়—দারুণ যন্ত্রণায় নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসতে চাইল। আর সেই যন্ত্রণা ছুটে বেরিয়ে এল হাসির দমকে দমকে। মাটিতে বসে পড়ে আমি হেসে চললুম।

আমার সেই অদ্ভুত হাসির আওয়াজ আর তার চাইতেও অদ্ভুত মুখ-ভঙ্গির দিকে তাকিয়ে দর্শকেরা থেমে গেল এক মুহূর্তের জন্যে। পরক্ষণেই

হাসি আর হাততালিতে তাঁবু ফেটে যেতে লাগল।

অসম্ভব লেগেছিল, ভাল করে দাঁড়াতে পারছিলুম না। আর যন্ত্রণা যত টনটন করছিল, ততই হাসি পাচ্ছিল আমার—ততই হাসাতে ইচ্ছে করছিল সকলকে।

যখন বেরিয়ে এলুম, ম্যানেজার শুদ্ধু হাসছে।

সাবাস্ বাচ্চু, বহুৎ আচ্ছা। আমাদের খেল্ তুই একাই মেরে দিবি মনে হচ্ছে।

কেবল রামাইয়া হাসল না। মেঘের মতো গম্ভীর হয়ে রইল। আর একবার স্পষ্ট শুনলুম কাকে যেন বলছে ঃ ছোঃ—ওকে ক্লাউন বলে! অমন ভালুকের মতো চেহারা থাকলে লোকে এমনিতেই হাসে, কষ্ট করে আর খেল্ দেখাতে হয় না!

হিংসে!

পাঁজরার টনটনে যন্ত্রণা নিয়েই সেদিন খেলার সঙ্গে সমানে তাল দিয়ে চললুম আমি। স্টীম পেলে এঞ্জিন যেমন ছোটে—আমার কৌতুকও সেদিন তেমনি করে ছুটে চলল। জনতার চীৎকার উঠতে লাগলঃ এন্‌কোর—এন্‌কোর!

একজন যখন কষ্ট পায়—আর একজন তখন বেশি করে হাততালি দেয়। আমি বুঝেছিলুম। সেইদিনই বুঝেছিলুম যেদিন চৌরঙ্গীতে সাহেবের লাথি খেয়ে খেয়ে আমি টাকা আদায় করেছিলুম।

দুনিয়ার হালই এই।

সেদিন খেলার শেষে ম্যানেজার আমাকে বুকে জড়িয়ে ধরলে। তারপর সুতো-বাঁধা একটা মেডেল আমার গলায় পরিয়ে পিঠ চাপড়ে দিয়ে বললে, জিতা রহো বাচ্চা—বহুৎ আচ্ছা, বহুৎ আচ্ছা!

একটু দূরে দেখি হাঁড়ির মতো মুখ করে আছে রামাইয়া। আমি একটা সিগারেট দিতে গেলুম। রামাইয়া হঠাৎ চিৎকার করে উঠলঃ গেট্ আউট্! তারপর নিজেই সরে গেল সামনে থেকে।

আমার মায়া হল ওর জন্যে। তাকিয়ে দেখলুম, বুকের ওপর রুপোর মেডেলটা ঝলমল করছে। আমার প্রথম পুরস্কার। আজ জানি, আমার ভাগ্য-গগনের গ্রহটাই সেদিন রুপোর মেডেল হয়ে আজ ঝকমক করে উঠেছিল। এই পুরস্কার পাওয়ার জন্যেই পৃথিবীতে আমি এসেছি।

একটা কাণ্ড হয়ে গেল সেই রাত্রে।

ক্লান্তি আর যন্ত্রণায় নিথর ঘুমে তলিয়ে গেছি। এখন সময় ঠিক বুঝতে পারলুম, কে যেন আস্তে আস্তে আমাকে ঠেলছে। যেন আমার মুখের ওপর আস্তে আস্তে করে নিঃশ্বাস পড়ছে। বরফের মতো ঠাণ্ডা তার আঙুলের ছোঁয়া—আগুনের হল্‌কার মতো তার শ্বাসের স্পর্শ।

আমি চোখ ফেললুম। চোখের দৃষ্টি তখনো ঘুমে আবছা। যেন দেখলুম, অন্ধকার তাঁবুতে আমার বিছানা ঘেঁষে কে একটি মেয়ে দাঁড়িয়ে। আমার মাথা নড়তে দেখে সে যেন ঠোঁটে আঙুল রাখল, যেন ফিসফিসিয়ে বললে, চুপ—চুপ!

আর আমি সঙ্গে সঙ্গে কেমন অদ্ভুত গলায় চেঁচিয়ে উঠলুম ঃ কে—কে?

—বুদ্ধু!

একটা প্রায় নিঃশব্দ তর্জন। তারপর তাঁবুর পর্দা তুলে একটা ছায়া ছুটে চলে গেল বাইরে। এমনভাবে গেল যে তার পায়ের আওয়াজ পর্যন্ত শোনা গেল না।

আমি খাটিয়ার ওপর উঠে বসে আবার চেঁচিয়ে উঠলুম ঃ কে—কে?

পাশের খাটিয়ায় ঘুমুচ্ছিল সুব্বারাও। ও ঘুমোয় কুম্ভকর্ণের মতো—কানের কাছে ঢাক পিটলেও রাত সাড়ে চারটের আগে ওকে তোলা যায় না। কিন্তু আমার গলার আওয়াজ বোধ হয় ঢাকের চাইতেও কর্কশ। বিরক্ত হয়ে জেগে উঠল সুব্বারাও ঃ কী হয়েছে? অমন বাজখাঁই শোর তুলছিস কেন মাঝরাতে?

—কে যেন ঘরে এসেছিল মনে হল।

—তোর মুণ্ডু।

—সত্যিই কে যেন এসেছিল, ঘর থেকে ছুটে পালিয়ে গেল।

—কুত্তা-টুত্তা হবে।

—না—না, কুত্তা নয়, মানুষ!

সুব্বারাও বিরক্ত হয়ে বললে, হুঁ—মানুষ!—তারপর কম্বলের মধ্যে মাথা গুঁজে বললে, আশমান থেকে নেমে এসেছিল নীলম্ পরী। ডানা মেলে উড়তে উড়তে তোর সুরৎ দেখে চোখে ঘোর লেগে গিয়েছিল। ভেবেছিল, সঙ্গে করে আকাশে নিয়ে চলে যাবে! নে—ঘুমো এখন। খামোকা আর চিল্লাবি তো এক থাপ্পড় বসিয়ে তোর কান ছিঁড়ে দেব।

দু মিনিটের মধ্যে আবার সুব্বারাওয়ের নাক ডাকতে লাগল।

কিন্তু আমি ঘুমুতে পারলুম না। একটু পরে আস্তে আস্তে বেরিয়ে এলুম বাইরে। আকাশে একরাশ শীতল তারা। শীতের বাতাস মুখের ওপর দিয়ে ছুরির ধারের মতো বয়ে চলে যাচ্ছে।

তবু আমার মনে হল ওই ঠাণ্ডা হাওয়াটা কা'র হাতের অদ্ভুত হিমার্ত স্পর্শের মতো; মনে হল আমার মুখের ওপর কে যেন গরম নিঃশ্বাস ফেলছে বার বার। মাঠের একপাশে যে কুয়াশা জমে উঠেছে—কে যেন ছায়ার মতো সরে যাচ্ছে ওর ভেতরে।

পদ্মা?

মাথার ভেতর রক্ত চল্‌কে উঠল। হেসে ওঠবার জন্যে আমি নিচের ঠোঁটটার ওপর শক্ত করে দাঁতের চাপ বসিয়ে দিলুম। কিন্তু হাসি এল না—একবারও না।

পদ্মার জন্যে আমার মনের ভেতরটা এ-রকম লাগে কেন? কেন এমন হয়?

আমি চোখ বুজলুম। দেখতে পেলুম, ফুলে ফুলে ভরা দুটো কাঞ্চন গাছ; রাংচিতের বেড়া পার হয়ে সেই দামে-ভরা পুকুরটা—যার ওপর দুটো জলপিপি হেঁটে হেঁটে পোকা খুঁজে বেড়াচ্ছে; অনেক পাখির ডাকে আকাশ ভরে উঠেছে আর বিকেলের সোনাঝুরি রোদে রোদ-পোয়ানো বুড়ীর মতো আলোকলতার জাল জড়িয়ে বসে আছে ঝুপ্‌সী কুলগাছটা।

আব—আর আনন্দের ছবি। কিন্তু পদ্মার সঙ্গে এর কি কোনো মিল আছে? কোথাও আছে—ঠিক বুঝতে পারছি না। এরা সবাই একসঙ্গে মিলে আনন্দের ছবির চাইতে অনেক—অনেক বড়ো একটা ছবি হয়ে উঠেছে। কিন্তু আমি কেবল কয়েকটা হালকা হালকা রেখাই দেখতে পাচ্ছি—ছবির সবটা কিছু বুঝতে পারছি না।

দূরে শেয়াল ডাকল। হঠাৎ মনে পড়ল সেকেণ্ড মাস্টারকে। চোখের সামনে ভেসে উঠল সেই শ্যাওলা-ধরা পুরোনো মড়ার মাথাটা—যার ওপর ঝিকমিক করে জোনাক জ্বলছিল। আবার শেয়াল ডাকল। কিন্তু ও তো শেয়ালের ডাক নয়! স্পষ্ট শুনলুম, কোথায় যেন চিৎকার করে হাসছে মহবুব মিঞা।

আমি সভয়ে তাঁবুর মধ্যে ফিরে এলুম। পদ্মা কোথাও নেই। চারদিকে

দাঁড়িয়ে আছে সেকেণ্ড মাস্টার আর মহবুব মিঞা। আর আকাশ-ভরা তারাগুলো হা-হা করে উঠছে হাসির ধমকে।

ভোর বেলা উঠে দাঁতন করছি—তিন চারটে মেয়ে কলধ্বনি তুলে গেল পাশ দিয়ে। আর ঠিক আমার কানের কাছে—রাত্রে যেমন করে শুনেছিলুম, তেমনি ফিস্‌ফিসে আওয়াজে কে যেন বলে গেল ঃ বুদ্ধু!

বিদ্যুৎচমকে আমি ফিরে তাকালুম। কে—কে বললে এই কথা?

রাধা—পদ্মা—রুক্‌মিণী—অনসূয়া—কে এসেছিল রাত্রির অন্ধকারে? কে আমাকে এমন করে ধিক্কার দিয়ে গেল এখন?

বড় টেণ্টটার মধ্যে মিলিয়ে গেছে মেয়েরা। কথাটা কে বলেছে অনুমান করবারও উপায় নেই। আমি নির্বোধের মতো দাঁড়িয়ে রইলুম।

॥ আট ॥

পদ্মা ট্র্যাপিজে দুলছে। সেই আশ্চর্য শরীর—আশ্চর্য তার দোলা।

খালি টেণ্টের ভেতরে প্র্যাক্‌টিস করছে সবাই। কেবল নেই জাপানীরা, হফম্যান আর হরেন দাস। ওদের রোজ মহড়া দেবার দরকার হয় না।

আমি গ্যালারীর একপাশে বসে দেখছিলুম খেলা। কিন্তু চোখ বার-বার গিয়ে পড়ছিল পদ্মার ওপর। প্রাণপণ চেষ্টা করেও ওর দিক থেকে কিছুতেই সরিয়ে নিতে পারছি না দৃষ্টিটাকে। বিনা নেটেই কখনো কখনো প্র্যাক্‌টিস্‌ করে পদ্মা—পাখির মতো উড়ে যায় মহাশূন্যে দিয়ে। যদি পড়ে—যদি পড়ে কোনোদিন?

—কী দেখছ? পদ্মাকে?

চমকে তাকালুম। অনুসূয়া। এই দলের ভেতরে সবচেয়ে গম্ভীর—সবচেয়ে শান্ত।

কী বলব বুঝতে পারলুম না। কিন্তু কেমন অপরিচিত মনে হল অনসূয়াকে। একটা চাপা উত্তেজনায় যেন চোখমুখ লাল। এতক্ষণ প্র্যাক্‌টিস্‌ করছিল—শ্বাস ফেলছে অল্প অল্প। শানানো চোখের তারায় কী একটা দপ দপ করছে।

অনসূয়া আবার বললে, পদ্মা ছাড়া আর বুঝি কিছু চোখে লাগে না? জান্‌বর কাঁহাকা। ভেবেছো, তোমার ওই ভূতুড়ে চেহারা দেখে পদ্মার মন ভুলবে?

এবারও জবাব দেবার সুযোগ পেলুম না। তৎক্ষণাৎ অনসূয়া সরে গেল সামনে থেকে। যেন কিছুই হয়নি—এমনিভাবে একটা রিং ধরে ঝুলে পড়ল।

মাথার ভেতরটা এলোমেলো হয়ে গল। কিছুক্ষণ চুপ করে বসে রইলুম আমি। তারপর বেরিয়ে এলুম বাইরে। ঘাসের ওপর একটা কাণ্ড পড়ে ছিল।

কী মনে করে তুলে নিলুম সেটা, নির্মমভাবে বার কয়েক বসিয়ে দিলুম নিজের বাঁ-হাতটার ওপর।

সুর-বাঁধা হাসির যন্ত্রে ঝঙ্কার লাগল। অট্টহাসিতে ফেটে পড়লুম। একটু দূরেই একটা ঘোড়া বাঁধা ছিল ভয় পেয়ে চারপায়ে লাফিয়ে উঠল সেটা।

সন্দেহের জট খুলল সেই রাত্রে।

আজ ঘুম আসেনি। নিজের খাটিয়ায় শুয়ে আছি চিৎ হয়ে। সুব্বারাও অভ্যস্ত নিয়মে নাক ডাকিয়ে চলেছে। আমি আবছা অন্ধকারে তাঁবুর ওপরের ত্রিকোণটার দিকে তাকিয়ে আছি। আনন্দ, জলাপিপি—বিকেলের রোদে কাঞ্চন ফুলের গাছ আর পদ্মা—সব মিলিছে একটা ছবির আদ্রা তৈরি হয়েছে। ছবিটা দেখতে পাচ্ছি রেখায় রেখায়—কিন্তু তার কোনো স্পষ্ট রূপ বুঝতে পারছি না।

হঠাৎ যেন একটুখানি হাওয়া ঢুকল ভেতরে। আমি মুখ ফেরালুম। নিঃশব্দে তাঁবুর পর্দা সরে গেছে। বাতাসের চেয়েও লঘু পায়ে কে এসে ঢুকেছে। একটি মেয়ের ছায়ামূর্তি—তার বেণী দুটোও দেখতে পাচ্ছি যেন।

দমবন্ধ করে আমি অপেক্ষা করতে লাগলুম। ছায়ামূর্তিটা ধীরে ধীরে এগিয়ে এল আমার খাটিয়ার কাছে। তার মাথাটা আমার মুখের কাছে নেমে এল—তপ্ত নিঃশ্বাসের স্পর্শ পেলুম। তারপর একটা আঙুল ঠোঁটে তুলে সে তেমনি নিঃশব্দ গলায় বললে, বাচ্চু!

আমি আজ আর বোকামো করব না। এই দুর্বোধ্য নাটকের একটা শেষ দেখতে চাই।

—কে? ফিস্‌ফিস্‌ করে জানতে চাইলুম।

—এসো, দরকার আছে।

কৌতূহলে, উত্তেজনায় আমি উঠে বসলুম। পদ্মা? বুঝতে পাবলুম না।

মেয়েটা একবার তাকালো ঘুমন্ত সুব্বারাওয়ের দিকে—কয়েক মুহূর্ত কান পেতে শুনল তার নাকের ডাক। তারপর তার ঠাণ্ডা হাতেব ছোঁওয়া লাগল আমার আঙুলে।

—এসো।

আমি উঠে পড়লুম। মন্ত্রমুগ্ধের মতো বেরিয়ে এলুম তাঁবু থেকে।

একবারের জন্যে মনে হল—নিশির ডাক? পিসিমা বলত—নিশির ডাকে মানুষ ঘুম থেকে বাইরে বেরিয়ে আসে, আর অপদেবতারা তাকে ভুলিয়ে—মাঠে, জলায়, জঙ্গলে নিয়ে গিয়ে মেরে ফেলে। এও কি তাই?

কিন্তু পদ্মা যদি নিশির ডাক হয়ে আসে—তা হলে মরতেও আমার ভয় নেই।

তাঁবুর বাইরে আসতে পা থেকে মাথা পর্যন্ত চমকে উঠল। পদ্মা যদি না হয়—তা হলে আর কে হতে পারে তা-ও আমি অনুমান করেছিলুম। কিন্তু না—অনসূয়াও নয়।

আমি কেবল বলতে পারলুম ঃ রাধা!

রাধার শাদা দাঁত ঝলকে উঠল অন্ধকারে।

—রাধাই তো। তাই তো কালা কান্‌হাইয়ার কাছে আসতে হল আমাকে।

—কিন্তু এসব বে-আইনি, রাধা। ম্যানেজার জানতে পারলে আমার চামড়া খুলে নেবে! তুমি কেন এসেছ এভাবে? কী চাও?

—বুদ্ধু!—রাধা চাপা গলায় বললে, কেন এসেছি তা বলব এখুনি। এসো।

আমার হাতে রাধার ঠাণ্ডা হাত পড়ল। সাপের মতো কয়েকটা আঙুলের পাক লাগল কব্জীতে। অনুভব করলুম রাধা আমাকে টেনে নিয়ে চলেছে।

বড় টেণ্টের ভেতর একটা মিট্‌মিটে বালব্‌ জ্বলছে—মাঝখানে কিছু আলো—চারদিকে অন্ধকার। যেখানে বাঘ সিংহের খাঁচা—তারই দিকে রাধা আমায় টেনে নিয়ে এল।

—কী চাও রাধা—কী চাও?

রাধার সমস্ত শরীরটা সাপের মতো আমাকে জড়িয়ে ধরল। সঙ্গে সঙ্গে আমি বুঝতে পারলুম, রাধা কী চায়।

—এ কী করছ রাধা—ছাড়ো—ছাড়ো! চিন্নুর সঙ্গে যে তোমার বিয়ে হবে—

—চুলোয় যাক চিন্নু! চাপা তর্জন এল রাধার। আমার পুরু পুরু কুৎসিত ঠোঁটের ওপর একটা তীব্র স্পর্শ নেমে এল হঠাৎ—যেন সাপে ছোবল মেরেছে সেখানে।

—রাধা, ছাড়ো আমাকে। আমি প্রাণপণে নিজেকে ছাড়িয়ে নিতে চাইলুম ঃ

এ অন্যায়—ভয়ানক অন্যায়। ম্যানেজার টের পেলে—! ছাড়ো, নইলে আমি লোক জাগাব।

—লোক জাগাবে? —আমার কানের কাছে সাপের শিসের মতো নিষ্ঠুর আওয়াজ এল ঃ তা হলে আমি বলব, বাইরে এসেছিলুম—তুমি আমার মুখে হাতচাপা দিয়ে জোর করে টেনে এনেছে। তোমার যা চেহারা—গায়ে তোমার যা অসুরের মতো জোর—তোমার কথা কেউ বিশ্বাস করবে না।

শীতে আমার শরীর কালিয়ে আসছিল, এবার যেন সর্বাঙ্গ জমাট বেঁধে গেল। আর তারপরেই রাধার একটা অদ্ভূত অমানুষিক আকর্ষণে দুজনে দুই কুস্তিগীরের মতো গড়িয়ে পড়লুম ভাঁজ-করা কতগুলো সতরঞ্চির ওপরে। মনে হল, আজ এই মুহূর্তে আমার চাইতে রাধার গায়ের জোর অনেক বেশি। ও যেন সার্কাসের সব চাইতে বড় হাতিটার শক্তি নিয়ে এসেছে গায়ে।

আমার মুখে একটার পর একটা হিংস্র সাপের ছোবল পড়তে লাগল। আর আনন্দের আঁকা ছবিগুলোর চাইতেও অনেক—অনেক বড় যে ছবিটা আমার আকাশে ছড়িয়ে পড়ছিল—এক মুহূর্তে ঘন কালির মতো কালো মেঘ ছড়িয়ে কে যেন তাকে লেপে-মুছে একাকার করে দিলে!

যখন উঠে দাঁড়ালুম—তখন বাধার মুখটা সেই পুরোনো মড়ার মাথার মতো দেখাচ্ছে। চোখ দুটো জ্বলছে দুটো জোনাকির মতো।

ঘৃণায়, ভয়ে, অসহ্য ক্রোধে কিছুক্ষণ ওর দিকে তাকিয়ে রইলুম আমি। তারপর দাঁতে দাঁতে চেপে বললুম, কুত্তী—কুত্তী কাঁহাকা!

বিদ্যুতের মতো উঠে এল রাধার হাতটা। একটা প্রচণ্ড চড় পড়ল গালে।

—জান্‌বর! জান্‌বর-কাঁহাকা! রাধার গলা থেকেও একবার যেন খানিকটা উগ্র বিষ উছলে পড়ল। তারপরেই ছায়ার মতো কোথায় মিলিয়ে গেল সে।

আমি দাঁড়িয়ে রইলুম। অনুভব করছিলুম, আমার সারা শরীর যেন ক্ষত-বিক্ষত হয়ে গেছে—চিনচিন করছে জ্বলছে সে-সব জায়গায়।

কী একটা কাঁটার মতো জ্বলছিল মুঠো-করা ডান হাতের ভেতর। হাতটা খুলে ফেললুম। রাধার কানের একটা সোনার রিং—কখন ভেঙে আমার হাতে চলে এসেছে।

রিংটাকে ছুড়ে ফেলে দিয়ে আমি ফিরে এলুম। একটা অসহ্য অপমান আর অকথ্য ঘৃণায় আমার সমস্ত স্নায়ুগুলো যেন তোলপাড় হয়ে যাচ্ছে। তাঁবুর বাইরে বেরিয়ে এসে আমি বমি করে ফেললুম।

গায়ের জোরে এই প্রথম হারলুম আমি। এই প্রথমবার।

বমিটা ক'রে শরীর যেন খানিক স্বাভাবিক হয়ে এল। তখন মনে হল, দুনিয়াই এই। সব সঙের খেলা। অদ্ভুত, অস্বাভাবিক না হলে মানুষের সুখ নেই। শুধু ক্লাউনের খেলা দেখেই লোকে হাসে—কিন্তু নিজের খেলা দেখবার মতো চোখ কারোই নেই সংসারে। নিজেকে কেউ দেখতে পায় না।

তার পরের দিন থেকে রাধা আর কথা বলেনি আমার সঙ্গে। ও হয়তো আর আসবে না কোনোদিন।

চুলোয় যাক। কুত্তী।

খেলায় আমার নাম হচ্ছিল চারদিকে। জানি—একজনের তা অসহ্য হয়ে উঠছিল। সে সার্কাসের পুরোনো ক্লাউন রামাইয়া।

এতদিন ধরে সে-ই ছিল সার্কাসে হাসির রাজা। বুঝতে পেরেছিল, আমি তার আসন টলিয়ে দিয়েছি। আমাকে জব্দ করবার সুযোগ খুঁজছিল সে। তক্কে তক্কেই ছিল।

ঘোড়ার খেলা চলছে সেদিন। তিনটে ঘোড়া তীর বেগে চক্র দিচ্ছে, ক্ষুরের আওয়াজ ছুটছে, আর তাদের ওপর লাফিয়ে লাফিয়ে ঘোড়া বদল করছে রাধা। জ্বল জ্বল করে জ্বলছে তার চোখ, চুলগুলো উড়ছে হাওয়ায়, নিঃশ্বাস বন্ধ করে খেলা দেখছে লোকে।

এমন সময় ভাঁড়ামো করা বারণ। যদি একটু অন্যমনস্ক হয়ে যায়, একবারের জন্যে লক্ষ্য নষ্ট হয়ে যায়, তা হলে যে-কোন অঘটন ঘটে যেতে পারে।

আমি দেখছিলুম রাধাকে। মনে হচ্ছিল, এর সঙ্গে কি রাতের মিল আছে কোথাও? ঠিক সেই সময় পেছন থেকে এল রামাইয়া। পা ধরে হ্যাঁচকা টান মারল আমার

হুড়মুড় করে পড়ে গিয়েই উঠতে যাচ্ছি, তৎক্ষণাৎ রামাইয়া আমার পিঠে চেপে বসল। পা দুটোকে শক্ত করে আমার পাঁজরে এমন চাপ দিল যে মনে হল যন্ত্রণার টনটনানিতে আমার আবার নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে যাবে। তক্ষুণি আমি শব্দ করে হেসে উঠলুম।

রামাইয়া বলল, আরে, মেরা আরব কা টাট্টু—হাস্‌তা কেঁউ? দৌড় লাগাও—দৌড় লাগাও—

আবার পাঁজরায় সেই অসহ্য চাপ!

চার পায়ে যথাসাধ্য দৌড় লাগাবার চেষ্টা করলুম। উপায় ছিল না।

আমার মাথার ওপর প্রাণপণে একটা ঘুষি মারল রামাইয়া।

জল্দি চলো—জল্দি চলো। বোলো—চিঁ-হিঁ-হিঁ—

বলতে হল ঃ চিঁ-হিঁ-হিঁ—

জোর কদম লাগাও—

পাঁজরায় যন্ত্রণা, হাঁটুতেও লাগছে, তবুও জোর কদম লাগাতে চেষ্টা করলুম।

দেখিয়ে বাবুজী, ঘোড়া বিগড় গিয়া। অ্যায়সা বদমাশ হো গিয়া—

বলতে বলতে আর এক ঘুষি।

আমি আবার হেসে উঠলুম। তারপর কাত হয়ে পড়ে গেলুম এক পাশে। পা খুলে নিয়ে তখনি উঠে দাঁড়াতে চেষ্টা করল রামাইয়া, পারল না। নিজের ফাঁদেই সে আটকে পড়েছিল। আমি আর একটা পাক দিতেই মটাৎ করে হাড় ভাঙবার আওয়াজ হল। বীভৎস যন্ত্রণায় অমানুষিক চিৎকার করে উঠল রামাইয়া। ঘোড়ার উপরে দাঁড়ানো রাধা ভয়ানক ভাবে চমকে উঠে ঘোড়ার গলা ধরে বসে পড়ল।

দর্শকেরা কিছু বুঝতে পারে নি, তারা হেসে উঠেছিল। কিন্তু বুঝেছিল রাধা, বুঝেছিল একটু দূরে দাঁড়িয়ে থাকা ম্যানেজার বুঝেছিলুম আমি।

চিত হয়ে পড়ে আছে রামাইয়া। চোখ দুটো খোলা, চোখের তারা কপালের দিকে উঠে স্থির হয়ে গেছে। জ্ঞান হারিয়েছে লোকটা।

মরে গেল নাকি? মুহূর্তের মধ্যে আমার গা বেয়ে ঘামের স্রোত নামল। তারপরেই বললুম, আব্ তো সোয়ারি পটক গিয়া।

বলে রামাইয়ার পা ধরে টানতে টানতে নিয়ে এলুম ভেতরে।

রামাইয়া মরে নি। পায়ের একটা হাড় ভেঙে গিয়েছিল। একটু পরেই চোখ মেলল। আর গ্যাঙাতে গ্যাঙাতে অশ্রাব্য গালিগালাজে আমার চোদ্দ-পুরুষকে উদ্ধার করতে লাগল।

কারও কিছু বলবার ছিল না। নিজের চোখেই সব দেখেছিল ম্যানেজার।

দোষ রামাইয়ার। ঘোড়ার খেলার সময় কেন গিয়েছিল ভাঁড়ামো করতে। পাঠাও হাসপাতাল। সেখান থেকে ফিরে এলে মাইনে চুকিয়ে বিদায় করে দোব ওকে।

হাউ হাউ করে কেঁদে উঠল রামাইয়া।

পনের বছর এই সার্কাসে কাজ করছি, বুড়ো হয়ে গেলুম এখানে। আজ পা ভেঙে আমাকে বেকার করে দিল। আর এই বিচার হল তার?

খাঁচার বুড়ো সিংহটার চাইতেও জোরে গর্জন করে উঠল ম্যানেজার। চুপ। একদম চুপ। যাও—পাঠিয়ে দাও একে হাসপাতালে—

তারপরে ফিরে তাকাল আমার দিকে।

দোষ করেছিল রামাইয়া, তাই বলে ওকে জানে মেরে দিবি বাঁদি কী বাচ্চা?

প্রকাণ্ড চাবুকটা হাওয়ায় শিশ্ টানল। আমার মুখের উপর দিয়ে যেন আগুনের সাপ খেলে গেল একটা। হেসে উঠেই আমি ঘুরে পড়লুম। অনেককাল আগে যেখানে বাবা একটা স্থায়ী চিহ্ন এঁকে দিয়েছিল, সেখান থেকে আবার নেমে আসতে লাগল রক্ত—ঠোঁটের কোণা দিয়ে সেই অপরূপ নোনা স্বাদ নেমে এসে আমার মুখ ভরে দিল।

আর দাঁড়াল না ম্যানেজার। বুকে মেডেলের মালা ঝলমলিয়ে চলে গেল ভেতরে। তার সময় নেই। এইবারে বাঘ-সিংহের শেষ খেলা আরম্ভ হবে।

দিনের পর দিন।

রামাইয়া ফিরে এল। চাকরি অবশ্য যায় নি, কিন্তু খুঁড়িয়ে হাঁটে এখনও। ভাল করে সারতে আরও সময় নেবে কিছুদিন। কিন্তু পায়ে আর জোর সে ফিরে পাবে না।

আমি জানি সার্কাসে আমার রূপ বদলে গেছে। আগে আমাকে দেখে সবাই হাসত, এখন ভয় পায়। জানে. আমি ভয়ঙ্কর। আমি হাসতে পারি, হাসাতে পারি; আর হাসতে, হাসাতে হাসাতে যে-কোন লোককে খুন করতে পারি। আর আমাকে গালাগাল দেয় রামাইয়া।

তোর জন্যে আমার সর্বনাশ হল। খুনী, ডাকু কোথাকার।

রামাইয়া লোক খারাপ নয়। আমি ক্ষমা চেয়েছি ওর কাছে, ভাব করতে চেষ্টা করেছি। রামাইয়া খুশীও হয়েছে খানিকটা। কিন্তু খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটতে গিয়ে যখনই পাটা টন্ টন্ করে ওঠে, তখুনি গালাগাল শুরু করে দেয়। আমার রাগ হয় না ওর ওপর, বরং মায়াই হয়।

কিন্তু বিঠু আমাকে ক্ষমা করে নি।

আমি মহব্বুব মিঞার দলে ছিলুম; মহব্বুবকে দেখেছি সোনা-বাঁধানো দাঁত কালুকে দেখেছি, গণেশকে দেখেছি। কলকাতার অন্ধকার গলি-ঘুঁজিতে যারা মানুষ শিকার করে, তাদের চিনতে আমার বাকি নেই। চোখের ভাষায় শয়তানের মনের কথা আমি বুঝতে পারি।

বিঠু ক্ষমা করে নি আমাকে। একদিন শেষ ফয়সালা হয়ে যাবে ওর সঙ্গে। হয় ও আমাকে হাসাবে, নইলে আমার ওপর দিয়েই নিজে প্রাণখোলা হাসি হেসে নেবে একবার।

আমার সঙ্গে আলাপ করে মিঠে গলায়।

তোমার খেলা খুব ভাল।

আমি ওর দিকে তাকাই। চোখের পাতা নড়ছে না, সাপের চোখের মত স্থির।

তোমার ভাল লাগে বুঝি?

শুধু ভাল লাগে? হাসতে হাসতে দম বন্ধ হয়ে যায়।

আমি বলি, খুব খুশী হলুম।

বিঠু মাথা নাড়তে থাকে।

আমার ভারী শখ ছিল খেলোয়াড় হবার। কিন্তু ম্যানেজার সায়েব বলে, আমাকে দিয়ে হবে না। জীবনটা এই ভাবেই কেটে গেল।

আমি চুপ করে থাকি।

বাচ্চু সায়েব, আমাকে ক্লাউনের খেলা শেখাবে?

বলি, শেখাব।

তারপর আবার বিঠুর দিকে চেয়ে দেখি। সেই আশ্চর্য স্থির দৃষ্টি। পাতা পড়ছে না—সাপের চোখের মত জেগে আছে।

জানি, ওর সঙ্গে একদিন আমার বোঝাপড়া হয়ে যাবে। ও আমাকে ছাড়বে না।

সার্কাস শেষ হয়ে গেলে আবার ফিরে আসি নিজের তাঁবুতে। দড়ির খাটিয়ায় ভাল করে নিজেকে এলিয়ে দেবার আগেই কখনও কখনও জোশিদোর সেই তারের বাজনাটা শুনতে পাই। ওদের তিনজনের পরিবারটা সার্কাসের মধ্যে একেবারে আলাদা। নিতান্ত দরকার না থাকলে ওরা কারও সঙ্গে কথা বলে না। এমন কি বাচ্চাটা পর্যন্ত ওদের কাছ থেকে চুপ করে থাকাটা শিখে নিয়েছে।

দড়ির খাটিয়ায় এপাশ-ওপাশ করতে করতে ওর বাজনা শুনি। শুনি সেই সুরটা—যা আমার মনের ভেতর সেই চাঁপা ফুলের গন্ধটাকে বয়ে আনে। আর—আর মনে পড়িয়ে দেয় পদ্মাকে। কিন্তু পদ্মার কথা এখন নয়।

ওই বাজনার সুর থেকে আমি ভাবতে চেষ্টা করি, কী যেন অনেক কথা ওর মধ্য দিয়ে বলা হয়ে চলেছে। যে কথা মুখে বলতে পারে না তাই যেন সুর হয়ে বেরিয়ে আসে।

কী কথা বলে? কী বলতে চায়?

বলে হরেন দাস। মোটর-সাইকেল নিয়ে তারের খাঁচার মধ্যে ঘূর্ণির মত ঘুরতে ঘুরতে উঠে যায় সে। রাত্রে আমি তার গান শুনি ঃ

কইন্যার দুঃখে আকাশ কান্দে
কান্দে রাইতের তারা,
ময়নামতী কইন্যা কাঁদে
চইক্ষে জলের ধারা।
সেই কান্দনে পাষাণ গলে
বন্ধুর পরাণ টলে না—

এত কান্না কেন হরেন দাসের? আমি হাসির মানুষ, কান্নাকে আমি বুঝতে পারি না। সেই এক-একদিন যখন বুকের ভেতরে এক-একটা আচমকা মোচড় দেয়, তখন ভাবি, হাসি ছাড়া আরও কিছু আছে। সে যে কী ঠিক বুঝতে পারি না। একটা অস্পষ্ট আভাসের মত কী যেন ছুঁয়ে যায় আমাকে, আমিও কি কেঁদে ফেলব একদিন?

অসম্ভব। হাসি নিয়ে জন্মেছি, হাসির মধ্যেই বেঁচে আছি আমি। সেই হাসিটা যদি কোনদিন শুকিয়ে যায়, তা হলে জল শুকিযে গেলে মাছ যেমন করে খাবি খায়, আমারও সেই দশা হবে। সেইদিনই মৃত্যু হবে আমার।

আমি পদ্মাকে ভাবি। আমাকে দেখলেই ও হাসে। সেই প্রথম দিন থেকেই যে হাসি ওর শুরু হয়েছিল, সে আর থামে নি। আমাকে দেখে পদ্মার সব চাইতে বেশি হাসি পায় এই কথাটা ভাবতেই আমার সবচেয়ে ভাল লাগে। রাধা সে রাতের পরে অনেক দূরে সরে গেছে। তার আগেও যেমন কেউ ছিল না—তার পরেও সে আর কেউ নয়। ওর চোখ দেখে জানি, ও আমাকে ঘৃণা করে। করুক।

কিন্তু হরেন দাসের সেই গোপন কথাটা আজও আমার জানা হয় নি। ওর যত কান্না সব বোধ হয় সেই কথাটার পেছনেই লুকিয়ে আছে।

ভাবনার সুর কাটে। জোশিদোর বাজনা থেমে গেছে। হবেন দাসের গলাও আর শোনা যায় না। একটা বাঘ দু-তিনবার হুম-হাম কবে সাড়া দিল, দূরে শহরের কতকগুলো কুকুর কেঁউ কেঁউ করে উঠল। মুথুস্বামীর তাঁবু থেকে খানিকটা চেঁচামেচি কানে এল, রুকমিনীব সঙ্গে ঝগড়া বাধিযেছে। ওদের মধ্যে প্রায়ই হয় ওরকম।

দিনের পর দিন।

হাসির নতুন নতুন কায়দা আবিষ্কাব করি আমি। খেলাতেও যত তৈরি হয়ে উঠেছি, হাসিও তত জমছে। দেখতে দেখতে প্রায দেড় বছর পার হয়ে গেল। এর মধ্যে ফ্লায়িং ট্র্যাপিজেব খেলাও শিখে নিয়েছি খানিকটা। আশা আছে একদিন পদ্মার সঙ্গে আমিও ট্র্যাপিজে উঠব।

আর সেইদিন আমার সব চাইতে ভাল খেলাটা দেখাব। তারই জন্যে অপেক্ষা কবে আছি।

॥ নয় ॥

নতুন ডোরা বাঘটা যখন এল, তখন আমরা গয়াতে।

সার্কাসের বাঘ সিংহ আমার ভালো লাগে না। বেঁচে থেকেও মরে আছে ওরা। নেশার ঘোরে ঝিমোচ্ছে রাতদিন। সার্কাসের সময় চাবুকের আওয়াজ দিয়ে দিয়ে তবে ওদের চেতিয়ে তুলতে হয়। আমি অবাক হয়ে ভাবি এই কাজের জন্যে গলায় কেন এতগুলো মেডেল পরে ম্যানেজার? মড়াগুলোকে মারবার মধ্যে বাহাদুরী কোথায়?

বরং ওর চাইতে আমাদের বাজনার দলটা ভালো। তাদের ব্যান্ডের তালে তালে ঘোড়া নেচে ওঠে, হাতির শরীর দুলতে আরম্ভ করে। ম্যানেজার যদি চাবুক না হাঁকড়ে বাজনা দিয়ে ওদের নাচাতে পারত, তা হলেই বোঝা যেত তার বাহাদুরী।

কিন্তু নতুন বাঘটাকে দেখলে মন খুশি হয়।

বাঘটা এল হাজারীবাগের জঙ্গল থেকে।

লোহা আর কাঠের খাঁচার মধ্যে গজরাতে গজরাতে সে এল। বয়েস বেশি নয়—সবে যৌবনে পা দিয়েছে মনে হয়। কালোয় আর সোনালিতে ঝলমল করছে শরীর। হিংস্র গর্জন করে থাবা মারছে খাঁচায়—ঝনঝন করে উঠছে একসঙ্গে। ওর দাঁতগুলোর ভঙ্গি দেখে মনে হচ্ছিল—গর্জন করছে না, অদ্ভুত ভঙ্গিতে যেন অট্টহাসি হেসে উঠছে।

এমন আশ্চর্য রূপ—এমন শক্তি! ও কী করে ধরা পড়ল সাঁওতালদের খাঁচায়? কতগুলো তুচ্ছ মানুষের ফাঁদে বোকার মতো ধরা পড়ে গেছে বলেই কি নিজেকে ব্যঙ্গ করছে ও? হেসে উঠছে এমনভাবে?

আমি মগ্ন হয়ে দেখছিলুম। চমক ভাঙল ম্যানেজারের গলার আওয়াজে।

এ বাঘ দিয়ে আমি কী করব রে?

সাঁওতালেরা বললে, কিনে লে সাহেব।

ম্যানেজার বললে, দূর! অত বড় বাঘে কী হবে? ও তো পোষ মানবে না। যদি বাচ্চা ধরে দিতে পারিস, তা হলে কিনে নেব আমরা। ভালো দাম দেব।

আমার বলতে ইচ্ছে করছিল, থাক্ না। এই মরা জানোয়ারের দলে থাকুক একটা জীবন্ত তেজী প্রাণী—মানুষের কাছে যে বশ মানে না—যার গায়ে এখনো বনের গন্ধ জড়িয়ে আছে। কিন্তু বলতে পারলুম না। ম্যানেজারের ওপর কথা বলবার মতো সাহস আমাদের কারো নেই।

সাঁওতালেরা নিরাশ হয়ে খাঁচা তুলতে যাচ্ছিল, হঠাৎ এগিয়ে এল পদ্মা।

রহুনে দেও।

আশ্চর্য হয়ে তাকালো ম্যানেজার।

কী হবে?

পদ্মা হেসে বললে, খেলবে।

কে খেলা দেখাবে একে?

রিং মাস্টার। ম্যানেজার সাহেব। পদ্মার চোখে একটা অচেনা আলো চিকচিক করে উঠল। আর তাই দেখে ম্যানেজারও অল্প একটু প্রশ্রয়ের হাসি হাসল। কিন্তু পদ্মার চোখের ওই আলো—ম্যানেজারের হাসিটা আমার যেন ভালো লাগল না। কোথায় যেন জ্বালা ধরে গেল।

ম্যানেজার একখানা হাত রাখল পদ্মার কাঁধের ওপর। আমার ইচ্ছে করল, হাতটাকে ধরে আমি দূরে ছুড়ে ফেলে দিই।

ম্যানেজার বললে, এ বাঘকে খেল্ শেখানো রিং মাস্টারের কাজ নয়।

রিং মাস্টার যা পারে না—দুনিয়ায় কেউ তা পারবে না।—পদ্মা ম্যানেজারের গা ঘেঁষে এগিয়ে এল অনেকখানি।

আমি জানি না, কেন এমন লাগছিল আমার। কেন মনে হচ্ছিল, এক ধাক্কা দিয়ে ম্যানেজারকে সরিয়ে দিয়ে আমি পদ্মার পাশে গিয়ে দাঁড়াই। দু হাতে বুকের মধ্যে টেনে আনি ওকে, বলি, না—ম্যানেজারও পারবে না। পারি আমি—যে দুনিয়ায় সব চাইতে আলাদা হয়ে জন্মেছি। মানুষের ঘরে আমি এসেছি—অথচ মানুষের আমি কেউ নই. একেবারে রাক্ষসের মতো দেখতে। হাতের ছ'টা আঙুলে আমি অনেক বেশি জোরে আঁকড়ে ধরতে পারি। আমার বন্যশক্তি নিয়ে ও বাঘের মহড়া কেবল আমিই নিতে পারি—আর কেউ

নয়, কেউ নয়!

বুকের মধ্যে রক্ত ফুটছিল আমার। জোরালো হাতের পেশীগুলি যেন কাঁপছিল অল্প অল্প। তবু আমি কিছু করতে পারলুম না। ম্যানেজার তো কেবল ম্যানেজারই নয়—বারো আনি সার্কাসেরও সে মালিক। আমি শুধু ক্লাউন ছাড়া আর কিছু নই। ব্যথা পেতে পারি, হাসতে পারি—আর নিজের অসহ্য যন্ত্রণায় যখন হাড়-পাঁজরা আমার গুঁড়িয়ে যেতে চায়. তখন অট্টহাসিতে ভরিয়ে তুলতে পারি দর্শকদের। আর কিছু পারি না।

ঠোঁটের ওপর দাঁত বসালুম। পেলুম নিজের রক্তের নোনা স্বাদ। কিন্তু সেই বেদনার চমকে—সেই রক্তের স্বাদে আমি এই মুহূর্তে একটুখানিও হেসে উঠতে পারলুম না।

নিজের ভাবনার মধ্যে ডুবে গিয়েছিলুম—কী কথাবার্তা হচ্ছে শুনতে পাই নি। চট্‌কা ভাঙলে দেখি একতাড়া নোট নিয়ে চলে যাচ্ছে সাঁওতালেরা। আর কী একটা হাসির কথা যেন বলেছে ম্যানেজার—পদ্মা হাসতে হাসতে এলিয়ে পড়েছে তার গায়ে।

আমি সরে এলুম। আর দাঁড়াতে পারছিলুম না ওখানে।

বাঘটা রয়ে গেছে। খাঁচা বদল হয়েছে তার। অনেক শক্ত বেড়ার ভেতরে সে নিশ্চিন্তে জায়গা পেয়েছে এখন। বশ মানাবার চেষ্টার ত্রুটি হয় নি—আফিং চলছে, চাবুক পড়ছে। কিন্তু এখন পর্যন্ত পোষ মানবার লক্ষণ দেখা গেল না। মানবে বলে মনেও হয় না।

বাঘটাকে কিনে নিতান্তই বাজে খরচ করা হয়েছে।

কিন্তু কেন এ কাজ করতে গেল ম্যানেজার? অত্যন্ত হিসেবি লোক সে। একটি পয়সাও তার হাত দিয়ে অকারণে অপচয় হয় না। কিসের দুর্বলতায় সে এতগুলো টাকা নষ্ট করল?

আমি ঘাসের ওপর শুয়ে শুয়ে ভাবতে চেষ্টা করছিলুম।

আজ তাঁবু ফেলা হচ্ছে, কাল থেকে খেলা আরম্ভ। যে সব বাচ্চার দল ভিড় করে বাঘ সিংহ দেখতে এসেছিল, তাদের চলে যেতে বলা হয়েছে। সবাই কাজে ব্যস্ত। বাঁশের আওয়াজ উঠছে. সামিয়ানা টানাটানি চলছে, গ্যালারী জোড়া হচ্ছে। ম্যানেজার প্রেসে গেছে হ্যান্ডবিলের ব্যবস্থায়। খেলোয়াড়েরা অনেকেই বেরিয়েছে নতুন শহর দেখতে। কয়েকটি মেয়ে গেছে তাদের সঙ্গে—

পদ্মাও গেছে। বাকী সবাই খানিক দূরে মধুস্বামীকে নিয়ে কী যেন রসিকতার আসর বসিয়েছে—আমি এখান থেকে তাদের কলধ্বনি শুনতে পাচ্ছিলুম। একটা হাতি ডেকে উঠল—তার আওয়াজ ছাপিয়ে উঠল বড় কাকাতুয়াটার কর্কশ আওয়াজে।

আমার কোনো কাজ নেই। আমি একরাশ নরম ঘাসের ওপর শুয়ে আছি। বিকেলের শেষ রোদে শীতের মরা ঘাসগুলো সোনার কুচির মতো জ্বলছে। সামনে নতুন বাঘের খাঁচাটা, বাঘটা মাথা তুলে একমনে একটা থাবা চেটে চলেছে। ওর নখে কি এখনো বনের মাটির স্বাদ জড়িয়ে আছে—জড়িয়ে আছে জংলা লতার রস? এমনি করে বনের মাথায় রোদ নিভে এলে ওকি জেগে উঠত কোনো ঝর্ণার ধারের পাথুরে ছায়ার ভেতর থেকে—মাথা তুলে বাতাসে শঙ্কিত হরিণের ঘ্রাণ, খরগোসের গন্ধ?

ও কেন এখানে? কেন ওকে কিনল ম্যানেজার?

উত্তরটা আমার মাথার মধ্যে জ্বলে উঠল। পদ্মাকে খুশি করতে? কিন্তু পদ্মার জন্যে কেন এমন অপব্যয় করল ম্যানেজার? কী তার স্বার্থ? সে তো দলের একজন খেলোয়াড় ছাড়া আর কেউ নয়। ওর মতো তো আরো অনেকে আছে—অনসূয়া, রাধা, রুক্মিণী? তাদের কারো কথায় কি এই বাঘটাকে কিনতে রাজী হত ম্যানেজার?

একটা দুর্বোধ হিংসা জেগে উঠছে বুকের ভেতর। ম্যানেজারকে—

ছিঃ—ছিঃ—এসব আমি কী ভাবছি? ম্যানেজারের কাছে কি কৃতজ্ঞতার শেষ আছে আমার? আমাকে দয়া করেছে সে, উদ্ধার করে এনেছে ভিক্ষুকের জীবন থেকে। আমি গোরার লাথি খেয়ে পয়সা রোজগার করছিলুম, সেই অপমান থেকে আমাকে তুলে এনেছে ম্যানেজার—দিয়েছে মানুষের মর্যাদা। আমাকে জাগিয়ে তুলেছে সত্যিকারের পরিচয়ের মধ্যে, গড়ে তুলেছে একনম্বর ক্লাউন!

ক্লাউন।

একটা শুকনো ঘাসের শিস্ কুড়িয়ে নিয়ে আমি চিবুতে লাগলুম। হাঁ, পয়লা নম্বরের ক্লাউন। সার্কাসের দলের সেরা হাসিয়ে রামাইয়াকে পর্যন্ত আমি ম্লান করে দিয়েছি। শুধু ম্লান নয়—চিরজীবনের মতো অচল করে দিয়েছি তাকে। এখন আমি এ-দলে হাসির রাজা।

শুধু এ দলেই?

না। এই এক বছরেই আমার নাম ছড়িয়ে পড়েছে। আর একটা দল থেকে লোক এসে কিছুদিন আগে চুপি-চুপি দেখা করেছিল আমার সঙ্গে। বলেছিল, অনেক বেশি মাইনে দেবে—একসঙ্গে কণ্ট্রাক্ট করে নেবে দশ বছরের।

আমি রাজী হই নি।

বলেছিলুম বেশি টাকা দিয়ে আমি কী করব? যা এখানে পাই, তাই আমার জমে। ত্রিসংসারে এমন কেউ নেই—যাকে আমি টাকা পাঠাতে পারি। তা ছাড়া ম্যানেজারের সঙ্গে নিমকহারামিও আমি করতে পারব না।

মুখ চুণ করে চলে গিয়েছিল লোকটা।

কিন্তু নিমকহারামি? সত্যিই কি ম্যানেজার বাঁচিয়েছে আমাকে—উদ্ধার করেছে গ্লানি থেকে? হঠাৎ মনে হল, জন্তুর মতো, রাক্ষসের মতো চেহারা হলেও তো আমি মানুষ। যদি হারুণের সঙ্গে থেকে ডক থেকে মাল পাচার করতুম, পুরোণো অভ্যাসে পথে পথে পকেট মেরে বেড়াতুম, কিংবা ভিক্ষা করতুম—গোরার লাথি খেয়ে টাকা রোজগার করতুম, তা হলেও আমার পরিচয় থাকত—রূপ বদলাত. কিতু একটা সম্পূর্ণ মানুষ হয়ে থাকতুম আমি। কিন্তু এ আমার কী করেছে ম্যানেজার? আমাকে সম্পূর্ণ মুছে দিয়ে দাঁড় করিয়েছে এক ক্লাউনকে—যাব আর কোনো পরিচয় নেই—যে কখনো একটা গোটা মানুষ হয়ে আর দাঁড়িয়ে উঠতে পারবে না।

আমি ক্লাউন। পদ্মা আমার কাছ থেকে অনেক দূরে। হাত বাড়িয়ে কোনোদিন চাঁদকেও ছোঁয়া যেতে পারে, কিন্তু পদ্মা কোনোদিন আমার নাগালের মধ্যে আসবে না। বড়জোর রাধার মতো কা'রো মনে কখনো কখনো জানোয়ার জেগে উঠলে উগ্র ক্ষুধায় আমার মতো জানোয়ারের কাছে ছুটে আসবে—একটা নিষ্ঠুর পাশবিক ক্ষণস্থায়ী সম্বন্ধ রচনা করে চলে যাবে—আর আমরা এ ওকে ঘৃণা করব—পৃথিবীর সব চাইতে বীভৎস ঘৃণায় আমরা জ্বলে যাব!

ম্যানেজার আমাকে মুছে দিয়েছে। পদ্মার কাছে কোনোদিন আমি যেতে পারব না।

সামনের ওই লাল রোদে জ্বলন্ত বাঘটার ধারালো থাবার মতো একটা থাবা মাটিতে বসিয়ে একগোছা মরা বিবর্ণ ঘাস আমি তুলে আনলুম—তারপর উঠে বসলুম। ঘাসগুলোকে টুকরো টুকরো করে ছিঁড়তে ছিঁড়তে ভাবলুম, না—আর নয়। পদ্মার কথা আমি ভাবব না। হাস্যকর হয়ে জন্মেছি—শেষ দিন পর্যন্ত হাসিয়েই যাব।

একটু দূরে একটা গাছের দিকে নজর পড়ল। কী একটা লতা জড়িয়ে জড়িয়ে উঠে গাছটাকে প্রায় আড়াল করে ফেলেছে। আমার স্মৃতি চমকে উঠল। এমনি একটা গাছ কবে দেখেছি—কোথায় দেখেছি?

ছোট পুকুরটার ওপর কলমির ফুল দুলছে। টিপিটিপি পা ফেলে একজোড়া ডাহুক চলছে—কী যেন খুঁটে খুঁটে খাচ্ছে। একবার পাখা ঝাড়ল—কী আশ্চর্য ময়ূরকণ্ঠী রঙ ওর পাখার তলায়! রাং-চিতার বেড়ার ওপর ঘুরে ঘুরে প্রজাপতি উড়ছে—যেন মুঠো করা চুলের পাপড়ি কে উড়িয়ে দিয়েছে হাওয়ায় হাওয়ায়। কেমন শিরশির করছে শরীর—আমার মাথায়, বুকে, পিঠে কার আল্‌তো আঙুলেরা খেলা করে বেড়াচ্ছে।

পিসিমা?

না—আনন্দ।

ঃ আমাদের বাড়ীতে আয় না ভাই মুরারি। কোনোদিন তো আসিস্‌ নি।

সেই কাঞ্চন ফুলের গাছদুটো আছে এখনো? একরাশ হাসির ফেনার মতো ফুল ফুটেছে যার ওপর? সেই ছোট টিনের বাড়ীটি? ওর মা এখনো কি বসে বসে তেমনিভাবে তৈরি করেন নারকেলের ছাঁচ ক্ষীরের চন্দ্রপুলি, চিঁড়ের মোয়া? রুণ্‌কি ঝুন্‌কি কি এখনো পুতুল খেলে? না—এতদিনে ওরা নিশ্চয় শ্বশুরবাড়ী চলে গেছে। আর আনন্দ একা কী করছে বসে বসে? সেই মিষ্টি মেয়েলি আনন্দ? চার বোনের এক ভাই?

আনন্দ ছবি আঁকে। এখন নিশ্চয় অনেক ভালো হয়েছে ওর ছবির হাত। পাখি, ফুল, প্রজাপতি আর মায়ের মুখ (ওর মা-র মুখ আমার মা-র মতো তো নয়। আমার মা-র মুখ আমি দেখিনি—কিন্তু বোকা-অলস-ঝগড়াটে মা-র চেহারা আন্দাজ করে নিতে পারি সহজেই।) আঁকে বসে বসে। সারা পৃথিবীটাই ওর কাছে রঙে ভরা—চার বোন আর মা-র স্নেহ ওর তুলির টানে টানে ফুটে ওঠে।

আমি আনন্দর চোখ পাই নি। অমন করে দেখতে শিখি নি পৃথিবীকে।

কী দেখেছি? সেকেণ্ড মাস্টারকে মেরে পালিয়ে আসবার পরে দেখেছি একটা জঙ্গলকে। ঝুপসী, অন্ধকার, জোয়ারের জল উঠে আসা নোংরা কাদায় থকথকে। তার ওপর গোখরো সাপের মতো দাঁড়িয়ে ডোরাকাটা বুনো ওলের ডগা। একটু দূরে সেই কাদামাখা মাটির ভেতর শ্যাওলা ধরা একটা মড়ার মাথা পড়ে আছে কতকাল থেকে। রাত ঘন হয়ে এলে সেই মড়ার মাথার ওপর

ঝিকমিক করে জোনাক জবলে—মনে হয় অসংখ্য চোখ মেলে যেন ওই মাথাটা একটু একটু করে উঠে আসছে আমার দিকে।

সেই আমার ভয়। আমি মুরারি ভটচাজ—ওরফে, ওরফে অনেক—যে আমি কখনো ভয় পাই নি—সেই আমাব প্রথম ভয়। পৃথিবীকে-সেই এক রূপে দেখেছি।

আরো দেখছি। মানুষ মরে গেলেও কাঠ-কয়লা দিয়ে দেওয়ালে লিখে রাখে তার নাম-ঠিকানা। দেখেছি, মানুষ চিতায় পুড়তে থাকলে সকলের চেহারা একরকম—যেন কালো কালো রবারের পুতুল। তখন আমার পদ্মার চেহারায় কোথাও কোনো তফাৎ নেই। আর দেখেছি, পেটের দায়ে যে মেয়েরা সংয়ের খেলা দেখায়—মুখে রং মেখে পেত্নীর মতো রক্তখেকো হাসিতে উছলে পড়ে—তারাই আবার বালিশে মুখ গুঁজে ছেলেমানুষের মতো ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদিতে থাকে। আরো চোখে পড়েছে—সামনের গঙ্গার জলে কেমন করে উল্‌টো আকাশের ছায়া পড়ে—মনে হয় কলকাতাটা যদি আকাশে উঠে গিয়ে সব অদ্ভুত আর এলোমেলো করে দেয়, বেশ হয়, ভারী মজা হয় তা হলে!

আমাব কাছে এই দুই চেহারা পৃথিবীর। মহবুব। সামান্য জবর হলেই বহুকাল আগে মবে যাওয়া সেই লাল বিবির জন্যে ডুকরে ডুকবে কাঁদতে থাকে, আবার কখন ফস্‌ করে ছোরা বের করে কালুর বুকের মধ্যে চালিয়ে দেয়। (আচ্ছা—মববাব পরে কি কালু হেসেছিল দাঁত বের করে? ওর সোনাবাঁধানো দাঁতগুলোই বা গেল কোথায়? মহবুব কি সেগুলো উপড়ে নিয়ে যায় নি?)

এই আমার পৃথিবী। ভয়ঙ্কর আর উদ্ভট। আনন্দ—কাঞ্চন ফুল—রুন্‌কি-ঝুন্‌কি—মা-র মিষ্টিমুখ—এ-সব আমার নয়। একটা ছবি দেখে-ছিলুম কেবল। রূপকথার ছবি।

অথচ, ওই ছবিটা কি আমাব পৃথিবী হতে পারত না? পিসিমা তো আমাকে রামায়ণ পর্যন্ত পেঁৗছে দিয়েছিল, কিন্তু আমার আনন্দর মতো একজন মা থাকলে সে কি পেঁৗছে দিতে পারত না আমাকেও অমনি ছবির রাজ্যে—অমনি একটা রূপকথার জীবনের ভেতরে? একটু হাসত—ভালোবাসত একটুখানি, মাথার চুলে আঙুল বুলিয়ে দিত—খেতে দিত কলাইকরা বাটিতে ঘি-মাখা মুড়ি আর দুটি নারকেলের নাড়ু?

আমার মা তা করে নি। আমাকে জন্ম দিয়েই মরে গিয়েছিল।

পারে। একজন হয়তো পারে। সে পদ্মা। তার একটুখানি ছোঁয়া

লাগলে হয়তো বা—

কে?

আমি ভয়ানকভাবে চমকে উঠলুম। কখন রোদটা ডুবে গেছে। ইলেক্‌ট্রিকের আলোগুলো জ্বলে ওঠে নি এখনো। বাঘের খাঁচাটা আবছায়া অন্ধকারে ম্লান—বাঘ থাবার ওপর মাথা নামিয়ে ঘুমিয়েই পড়েছে হয়তো। আমার সামনে এসে বসেছে বিঠু—সেই ঘা-খাওয়া চাকরটা।

বিঠু হাসল। দাঁতগুলো চিকচিক করে উঠল। কেন যেন কালুকে মনে পড়ে গেল আমার। বিঠুর দাঁতেও কি সোনাবাঁধানো?

বিঠু আজকাল আমার সঙ্গে খাতির করতে চেষ্টা করে। কিন্তু সে খাতিরের মানে আমি বুঝতে পারি। এই সার্কাসে দুজন আমার শত্রু আছে। একজন বিঠু—আর একজন রাধা।

মাথাটা কেমন ঝিমঝিম করছিল, চোখে ঘোব ঘোর লাগছিল। কিন্তু বিঠুকে দেখে সব কিছু ছাপিয়ে একটা তীব্র বিরক্তি চাড়া দিয়ে উঠল মনে। আমি উঠে পড়তে চাইলুম।

বিঠু বললে, আরে যাচ্ছ কোথায় বাচ্চু সাহেব, বোসো, বোসো। একটু গল্প করি তোমার সঙ্গে।

অগত্যা আবার বসতে হল। অভদ্রতা করতে পারি না।

একটা সিগারেট খাবে বাচ্চু সাহেব?

না।

বিঠু সিগাবেট ধরালো। একটু চুপ করে থেকে বললে, তোমার খেলার তো খুব নাম এখন। লোকে বাঘ-ভাল্লু দেখবে কি—তোমাকে দেখবার জন্যেই পাগল হয়ে ছুটে আসে।

আমি হাসলুম, জবাব দিলুম না।

তোমাকে দেখে আমার তাজ্জব লাগে বাচ্চু সাহেব। এত তাকৎ—এমন সাহস! তোমাকে কেন খেলতে দেয় না ম্যানেজার, কেন কেবল ক্লাউন সাজিয়ে রাখে? তোমাকে খেলতে নামালে অনেক বড় বড় খেলোয়াড় মার খেয়ে যাবে।

চাটুকারিতা করছে। বিরক্তিতে গা গুলিয়ে উঠল।

কে ভালো খেলবে না খেলবে সে ম্যানেজার জানে। আমার ও-সব কথায় দরকার নেই।

তোমার আর কি বাচ্চু সাহেব—সিগারেটের টানে বিঠুর মুখে খানিকটা

লালচে আভা পড়ল ঃ তুমি ভালো মানুষ—কোনোদিকে তোমার তো নজর নেই। কিন্তু সত্যি বলতে কি—আমাদের বড় দুঃখ হয়। আমরা প্রায়ই বলাবলি করি তোমার কথা। বলি—বাচ্চু সাহেবের ওপর ভারী অন্যায় করছে ম্যানেজার। তলোয়ার দিয়ে বিচালি কাটছে।

আমার একটা চড় বসিয়ে দিতে ইচ্ছে হল বিঠুকে। বিরক্ত গলায় বললুম, চুপ করো। ম্যানেজার যা ভালো বোঝে তা-ই করবে। ওর ভেতরে আমাদের কথা কইবার দরকার নেই।

অন্যায়টা তো বলতে হয়। বিঠু সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়ল।

আমি শুনতে চাই না।

বিঠু যেন বিমর্ষ হয়ে রইল কিছুক্ষণ। তারপর সিগারেটে আর একটা জোরালো টান দিয়ে বলতে লাগল ঃ তুমি আমাকে দেখতে পারো না বাচ্চু সাহেব। সেই কবে কী একটা হয়েছিল, তার কথা তুমি এখনো ভোলো নি। তুমিই আমাকে চৌবাচ্চায় ডুবিয়ে জান প্রায় নিকাশ করে দিয়েছিলে, অথচ তুমিই রাগ করে আছো। আর আমি সব ভুলে গেছি।

ভুলে গেছে? বিঠু? ওর চোখ কি আমি দেখি নি? মহবুবের দলে থাকতে থাকতে মানুষ চেনার কাজটা আমি খুব ভালো করেই চিনে নিয়েছিলুম।

হাসলুম। বললুম, উঠি।

আরো বোসো না দু-মিনিট—এত হড়বড়াচ্ছ কেন? আর একটা কথা বলব বাচ্চু সাহেব?

বিতৃষ্ণভাবে বললুম. বলো।

এই নয়া শেরটা। আমার কী মনে হয় জানো?

বলো শুনি?

ওকে ম্যানেজার বাগ মানাতে পারবে না। ওর সঙ্গে লড়নেবালা যদি কেউ থাকে—তবে সে তুমি। মনে হয়, বাঘের সঙ্গে তোমাকে একবার পাঞ্জা লড়তে দিলে—সে যে কী খেলা হয়—ওঃ! কোনো সার্কাসের তাম্বুতে সে-রকম খেলা কখনো হয় নি -কোনোদিন কেউ তা দেখে নি।

আবছা অন্ধকারে দুটো তীক্ষ্ণ চোখ আমি বিঠুর মুখের দিকে ফেলে দিতে চাইলুম। ওর কথার কী একটা মানে আছে কোথাও। ঠিক ধরতে পারছি না।

বিঠু বলে চলল, সিংপির পাহাড় মুলুকে আমাদের ঘর। ঘন জঙ্গল চারদিকে। বাঘের সঙ্গে দিনমান দেখা। আমার দেশের মানুষ বনে কাঠ কাটতে গিয়ে বাঘের সঙ্গে লড়ে। আমিই দুবলা—তাই সার্কাসের চাকর হয়ে আছি। কিন্তু বাচ্চু সাহেব—তোমাকে দেখলে সেই পাহাড়-বন আমার মনে পড়ে।

আমি শুনতে লাগলুম। বিঠু সিগারেটে আর একটা লম্বা টান দিয়ে গুঁজে দিলে ঘাসের ভেতর। বলে চলল আবার।

একবার বাঘে আমাদের বড় একটা দুধোল গাই মেরে ফেলল। তখন আমার ঠাকুর্দা বেঁচে—ষাটের ওপর তার বয়েস। ঠাকুর্দা শুনে বললে, আমি মারাঠী—আমার বংশ লড়াই করেছে শিবাজীর দলে। আমার গোরু মারবে বাঘে? বাঘের কত বড় কলিজা আমি দেখে নেব।

বিঠু অন্যমনস্কভাবে পাশের বাঘের খাঁচার ওপর একবার চোখ বুলিয়ে আনল : রুটি তৈরি ছিল, খেলে না। বললে, বাঘ না মেরে জলের ফোঁটাও মুখে দেব না আমি। একখানা ধারালো টাঙ্গি কাঁধে করে বেরিয়ে গেল তক্ষুণি। সারা দুপুর খুঁজে বাঘকে পেলো সাঁঝবেলায়। বাঘকেও খতম করল, নিজেও ফিরল না। পরদিন গাঁয়ের লোক বনের ভেতর থেকে মরা বাঘ আর মরা ঠাকুর্দাকে একসঙ্গেই কুড়িয়ে আনল।

বিঠু চুপ করে রইল কিছুক্ষণ। আলোগুলো জ্বলে উঠেছে এখন। বাঘটা ঘুমুচ্ছে। কিন্তু সেই আলোয় মনে হল, আর একটা বাঘ জেগে উঠেছে। বিঠুর চোখেই।

বিঠু আস্তে আস্তে বললে, আমরা মারাঠী। আমরা চিরদিন বদ্‌লা নিয়েছি—কোনোদিন ছেড়ে কথা কই নি।

আমি আবার চমকে উঠলুম। কী বলতে চায় বিঠু? কী ওর উদ্দেশ্য?

কিন্তু বিঠু হঠাৎ উঠে দাঁড়ালো। বললে, আচ্ছা, যাই বাচ্চু সাহেব। অনেক কাজ পড়ে আছে।

দ্রুতপায়ে তাঁবুর দিকে চলে গেল।

আমি একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলুম। কী বলতে চায় ও? কী আছে ওর মনে?

খাচার ভেতরে বাঘটা ঘুমুচ্ছে। কিন্তু বিঠুর মনের বাঘ কখনো ঘুমোয় না।

রাত বাড়ল। খাওয়া-দাওয়ার পাট মিটে গেছে। শুয়ে পড়েছে কেউ

কেউ। জাপানী জোশিদো তার বাজনায় দুর্বোধ্য সুর বাজিয়ে চলেছে একটানা। ম্যানেজার কিছু কিছু লোকজন নিয়ে এখনো চারদিকে দেখাশোনা করে বেড়াচ্ছে।

আমি পায়চারি করছি তাঁবুর সামনে। সারা শরীরে তীক্ষ্ম অস্বস্তিভরা উত্তেজনা। মনে হচ্ছে একটা কিছু না করে আমি যেন শান্তি পাব না। মাথার রগ দুটো ফেটে যেতে চাইছে।

আর একটা পৃথিবী ছিল। আর একটা রঙ ছিল কোথাও। কিন্তু সব মুছে গেল। সেই রঙের জগতে তুলি হাতে নিয়ে আমি কোনোদিন গিয়ে পৌঁছুতে পারব না। ও আনন্দের জন্যে—আমার জন্যে নয়!

আমি ক্লাউন।

পদ্মা। পদ্মাকে ভুলতে পারি না। যত চেষ্টা করি যেন মনের মধ্যে কেটে কেটে বসতে থাকে। আমার রক্তের ভেতর ঝড়ের গতিতে দুলতে থাকে একটা ফ্লায়িং-ট্র্যাপিজ—পদ্মার নিখুঁত শরীর, নিটোল বুক তার মধ্যে তীরের মতো উড়ে যায়। এ আমার কী হল! এ কী রোগ পেয়ে বসল আমাকে?

আর তো তেমন করে হাসতে পারি না। ঠোঁট কামড়ে দেখেছি, নিজেকে জোরে চিমটি কেটে দেখেছি- কই তেমন করে তো জেগে ওঠে না হাসির বিদ্যুৎ। আমি কি বদলে যাচ্ছি তা হলে? এই বদলে যাওয়ার অর্থ কী? আমি কি মরে যাব? আমি কি ফুরিয়ে যাব?

না-না-না—

একটা অদ্ভুত বিস্ময়কর শব্দ বেরিয়ে এল আমার গলা দিয়ে। সে-শব্দে আমি নিজেই চমকে উঠলুম। এবার নীরবে বললুম—না-না-না। এত সহজেই মরব না আমি—এখনি আমি শেষ হয়ে যাব না। পদ্মার সঙ্গে একটা বোঝাপড়া করে নিতে হবে আমায়। করতেই হবে।

পায়চারী করতে করতে ভাবতে লাগলুম, দূর থেকে কেন এমনভাবে জ্বলে মরছি আমি? কই—এখনো তো আমি সোজাসুজি কোনো কথা বলতে পারি নি পদ্মার সঙ্গে। এখনো তো চোখ তুলে তাকাতে পারি না তার দিকে। সেই জোনাকি জ্বলা মড়ার মাথাটা—সেই কাদার গন্ধ ভরা অন্ধকার বন আমার রক্তে ছড়িয়ে গেছে। আমি ম্যানেজারকে ভয় করি। ভয় করি তার চাবুকটাকে—যার আঘাত আমাকে সমুদ্রের মতো নিশ্চেতনার অতলে ক্রমাগত ডুবিয়ে নিতে থাকে!

বাঁদী কী বাচ্চা!

তাই বটে। আমি বাঁদীর ছেলে। আমি চাকর। আমি ক্লাউন।

সেইজন্যেই চোখ তুলে তাকাতে পারি না পদ্মার দিকে। বলতে পারি না—রাক্ষসের মতো চেহারা হলেও আমার হৃৎপিণ্ডে যে রক্ত ছুটছে তা মানুষেরই। এই ভীরু মন নিয়ে আমি কেমন করে এগিয়ে যাব পদ্মার কাছে?

ক্লাউন হয়ে নয়, মানুষ হয়ে মাথা তুলব। জোর করব, দাবি করব। ম্যানেজারের অত কাছ ঘেঁষে দাঁড়াতে দেব না ওকে। আমার এই দুটো শক্ত লোহায় গড়া বাহুতে—হাতের এই ছ'টা আঙুলে কী ভয়ঙ্কর আমার শক্তি। বিঠুই ঠিক বলেছে। ওই বাঘের সঙ্গে পাঞ্জা লড়েই প্রমাণ করে দেব আমার দাবি।

কে ওখানে? পদ্মা?

মগজের ভেতর রক্ত ছলকে উঠল। তাঁবুর ওপাশে একা কে বসে? একটু একটেরেয়?

শয়তান ভর করল আমাকে। যদি পদ্মা হয়? তা হলে—হাঁ, এখুনি—এই মুহূর্তেই। ইঁদুরের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে যাওয়া সতর্ক বেড়ালের মতো আমি এগিয়ে গেলুম সেদিকে।

পদ্মা নয়—রাধা।

আমাকে দেখে চকিতে দাঁড়িয়ে পড়ল সে। মুহূর্তের জন্যে একটা ঘৃণার ঢেউ বয়ে গেল আমার মনের ওপর দিয়ে। কিন্তু রাধা—রাধাই সই। এখন থেকেই আমার শক্তির পরীক্ষা আরম্ভ হবে।

রুদ্ধশ্বাসে বললুম, রাধা।

অস্পষ্ট আলোয় দেখলুম, রাধার চোখ জ্বলে উঠেছে। বললে, ভাগ্ জান্‌বর কাঁহাকা!

দাঁতে দাঁতে ঘষে বললুম, হাঁ, আমি জান্‌বর। আজ রাতে ফের তাম্বুর ভেতর তোমাকে আমি চাই।

বিদ্যুতের মতো রাধার কঠিন হাতের একটা চড় উঠে এল আমার মুখ লক্ষ্য করে। কিন্তু তার আগেই সে-হাত আমি ধরে ফেলেছি বজ্রের মুঠোয়। হাড়টা পর্যন্ত মড়মড় করে উঠল—যন্ত্রণায় বিকৃত হয়ে গেল রাধার মুখ। প্রায় আমার বুকের ওপরে এসে পড়ল—ক্রুদ্ধ ক্ষিপ্ত নিঃশ্বাস আমার মুখে আগুনের হল্‌কা ছড়িয়ে দিলে খানিকটা।

রাধা চিৎকার করে উঠতে পারত, ছুটে আসত ম্যানেজার, চাবুকের ঘায়ে ফেটে যেত আমার পিঠের চামড়া, তারপর লাথিতে লাথিতে আমাকে হয়তো রাস্তা পর্যন্ত গড়িয়ে দিয়ে আসত। কিন্তু রাধা চিৎকার করল না। জান্‌বর জান্‌বরকে ঠিক চিনে নিয়েছে।

তীব্র ফিস্‌ফিসানিতে সাপের গর্জন মিশিয়ে রাধা বললে, হাত ছোড়ো।

ছাড়ব না। বলো, আসবে কিনা রাতের বেলায়।

আমি যাচ্ছি। গিয়ে সব বলে দিচ্ছি ম্যানেজারকে।

বলো। ম্যানেজার আমাকে মারবে। তাড়িয়ে দেবে সার্কাস থেকে। কিন্তু যাওয়ার আগে তোমাকে আমি খুন করে যাব।

রাধা চুপ। নিঃশ্বাস পড়ছে ঘন ঘন। ওর চুল থেকে একটা তপ্ত গন্ধ আমার নাসারন্ধ্র দিয়ে সারা শরীরে সাপের বিষের মতো বয়ে যাচ্ছে। আমি বুঝেছি। রাধা সাপিনী।

রাধা আস্তে আস্তে বললে, হাত ছাড়ো। কেউ এসে পড়বে।

তুমি আসবে?

আসব।

দেখলুম, ওর চোখ আর নেই। দুটো নক্ষত্র জ্বলছে সেখানে।

হাত ছেড়ে দিলুম। সঙ্গে সঙ্গে রাধার অসমাপ্ত চড়টা আমার গালে এসে পড়ল।

—ভাগ—বুদ্ধু জান্‌বর কাঁহাকা!

পরক্ষণেই ছুটে পালিয়ে গেল কোন্‌দিকে। চড়টা জোরে মারে নি, আলতোভাবে ছুঁইয়ে গেছে কেবল। তবু সেইটুকুতেই যেন ক'দিন পরে আমার হাসির যন্ত্রে ঝঙ্কার জাগল। হা-হা করে হেসে উঠলুম আমি। আমি পারব—আমি নিশ্চয় পারব।

আবার হেসে উঠলুম পাগলের মতো। চারদিক কাঁপিয়ে তুলল আমার হাসির আওয়াজ।

দূর থেকে চিৎকার ভেসে এল ম্যানেজারের।

এই বাচ্চু--মাঝরাতে অমন করে হা-হা করে হাসছিস কেন ক্ষ্যাপার মতো? চুপ হো যা বাঁদীকা বাচ্চা! নেহি তো—

চাবুক মারবে? না চাবুকে আমার ভয় নেই। আমারও দিন আসছে। দেখব, পদ্মা এখন কার পাশে এসে ঘেঁষে দাঁড়ায়!

হল না। রাধা নয়।

দেখলুম, ও-ও আধখানা মানুষ। কানে কানে মুখ রেখে বলেছিল, তুমারা সাথ্ মেরী সাদী হো গয়ী। প্যার হো গয়ী।

কে শুনতে চায় ও কথা? জানোয়ার জানোয়ারকে চেয়েছে। কেন রাধা বলে ভালোবাসার কথা?

বলেছিলুম, আমি বিশ্রী দেখতে—রাক্ষসের মতো—আমার কর্কশ মুখের ওপর আশ্চর্য কোমল কয়েকটা আঙুল বুলিয়ে দিয়েছিল রাধা ঃ কে বলে? তুম্ মেরী কান্হাইয়া।

চিন্নু তোমাকে বিয়ে করতে চায়। আমি কেন?

নেহি, তুম। চলো—পালাই দুজনে। রাধা বলেছিল।

না—সে হয় না। রাধাকে আমি চাই না। ওকে ডেকে এনেছিলুম কেবল পদ্মার ওপর প্রতিশোধ নেবার জন্যে। ওকে দিয়ে আমি কী করব?

সারারাত কাটল অনিদ্রায়। পদ্মা ছাড়া আমি কাউকে চাই না। আর কেউ আমার নয়।

তখনও আবছা অন্ধকার। ভোরের আলো ভালো করে ফোটে নি। অনিদ্র শরীর মন নিয়ে অনেক আগেই উঠেছি। খোলা হাওয়ায় খানিকটা ডন-বৈঠক সেরে তাঁবুর ভেতরে যাচ্ছিলুম। আধ ঘণ্টা ধরে ট্র্যাপিজে দুলব এইবার। অনুভব করব, এই ট্র্যাপিজে পদ্মার হাতের ছোঁয়া—এর বাতাসে পদ্মার স্পর্শ জড়িয়ে রয়েছে।

সেই সময় নতুন বাঘটার খাঁচার সামনে আমি দাঁড়িয়ে পড়লুম। বাঘও জেগে উঠেছে। অস্পষ্ট আলোয় তার দুটো লাল চোখ প্রদীপের মত জ্বলছে।

গর্-র্—গর্-র্-র্—

মৃদু গর্জনে বাঘ আমাকে অভিনন্দন জানাল। ভোরের হাওয়ায় ওর গায়ের গন্ধটা পর্যন্ত আমার নতুন রকমের মনে হল। পুরনো বাঘ-সিংহের ভ্যাপ্সা-পচা গন্ধ নয়—এ গন্ধ আলাদা. এর সঙ্গে যেন বনের নতুন পাতা, নতুন ঘাস আর রাতের শিশির জড়িয়ে আছে।

আমি তাকিয়ে দেখছিলুম বাঘের দিকে। গর্-র্—গর্-র্র্-র্। দাঁত বের করে লক্ষ্য করছে আমাকে। হাসছে নাকি? বাঘ কি হাসতে পারে? হাসাই তো উচিত। অমন বীভৎস যার শক্তি, অমন জোর যার গায়ে সে হাসবে না তো হাসবে কে?

লক্ষ্য করি নি, পাশ থেকে ছায়ার মত কে এগিয়ে এসেছে। চমক ভাঙল তখন—যখন খটাং করে হঠাৎ উঠে গেল খাঁচার দরজা। আর তৎক্ষণাৎ ছায়ার মত সেই লোকটা ছুটে পালিয়ে গেল সেখান থেকে।

গর্-র্—গর্-র্-র্—

এবার ক্রুদ্ধ গর্জন করে খোলা দরজার বাইরে লাফিয়ে পড়ল বাঘ।

ব্যাপারটা বুঝতে আমার সময় লাগে নি। ঊর্ধ্বশ্বাসে চিৎকার করে বললুম, শের নিকাল গিয়া—

তারপর ছুটলুম প্রাণপণে।

কিন্তু কয়েক পা গিয়েই আমায় দাঁড়িয়ে পড়তে হল। একটি মেয়ে আর্তনাদ করে উঠেছে।

পদ্মা!

কী করে বাঘের সামনে এসে পড়ল কে জানে। কিন্তু বাঘ তখন তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বার উপক্রম করেছে, বিরাট ল্যাজটা আছড়াচ্ছে সাপের মত। আর তারই সামনে—মাত্র হাত কয়েক দূরেই মন্ত্রমুগ্ধের মত দাঁড়িয়ে আছে পদ্মা, তার যেন নড়বার শক্তি পর্যন্ত নেই!

এই আমার সময়! দেখে নাও পদ্মা, মিলিয়ে নাও। আমি কেবল ক্লাউনই নই।

বাঘ পদ্মার ওপর পড়বার আগে আমিই বাঘের ওপর গিয়ে পড়লুম। শক্ত করে টিপে ধরলুম বাঘের গলা। আর দু হাতের বাবোটা আঙুল বাঘের গলায় পাক দিতে লাগল।

বাঘও আমাকে ছাড়ল না।

দুজনে গড়িয়ে পড়লুম মাটিতে। বাঘের থাবার আঁচড়ে আমার বাঁ দিকেব পাঁজবার মাংস ছুলে ছুলে যাচ্ছে, আমি তা স্পষ্ট বুঝতে পারছিলুম। আর বাঘের গলার একটা অস্বাভাবিক গোঙানির মত আওয়াজকে ছাপিয়ে উঠে আমার হাসি উছলে উঠছিল ঝলকে ঝলকে।

তারপর চারদিকে হৈ-চৈ—হট্টগোল। লোক আসছে ঊর্ধ্বশ্বাসে। সেই অবস্থাতেও দেখলুম ম্যানেজারের দীর্ঘ দেহ একেবারে সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। সে হাত তুলল, কি একটা চক চক করে উঠল হাতে, দুম্ দুম্ করে রিভলভারের আওয়াজ হল।

ঠিক সময় মতই এসে পড়েছিল ম্যানেজার। তখন আমার দু হাতের

বারোটা আঙুলের বজ্র ফাঁসও খুলে গেছে বাঘের গলা থেকে। মুখ নীচু করে সে প্রকাণ্ড হাঁয়ের মধ্যে আমার মাথাটা গিলতে চলেছিল।

বাঘের কানে প্রায় রিভলভার ঠেকিয়েই গুলি করেছিল ম্যানেজার। নিঃশব্দে বাঘ আমার পাশে গড়িয়ে পড়ল। খানিকটা গরম রক্তের ফিন্‌কি ছড়িয়ে পড়ল আমার চোখে-মুখে।

বাঘের তীব্র নোনা রক্ত আস্বাদ করতে করতে আমি টলতে টলতে উঠে দাঁড়ালুম। আমার বাঁ দিকের পাঁজরায় তখন অসহ্য হাসির সুড়সুড়ি চলেছে। হাসতে হাসতে রক্তমাখা মুখে একবার আমি সকলের দিকে তাকাতে চাইলুম—পারলুম না; পরক্ষণেই কে যেন পায়ের তলা থেকে মাটিটাকে টেনে সরিয়ে নিলে।

আবার ঢেউয়ের পরে ঢেউ। আবার সমুদ্র। নিঃশেষে তলিয়ে চলেছি। শুধু পদ্মার মুখখানা হাজার হাজার টুকরো হয়ে চেতনার সীমান্তে জ্বলে উঠল একবার—যেমন করে মড়ার মাথায় আমি এক ঝাঁক জোনাকিকে জ্বলতে দেখেছিলুম।

আর বিড় বিড় করে বোধ হয় বলেছিলুম, দেখে নাও পদ্মা—দেখে নাও।

॥ দশ ॥

পাঁজরার চোটটা খুব বেশী না হলেও বেশ কিছুদিন ভোগাল।

ডাক্তারেরা বললেন, খুব বেঁচে গেল এ যাত্রা। আর একটু হলেই পাঁজরা ভেঙে হার্ট ফুঁড়ে বেরিয়ে যেত।

দুজনেই বাঙালী ডাক্তার। বাংলাতেই বলছিলেন।

এ যে খাস শয়তানের চেহারা মশাই। একে মারবে বাঘে?এমন বাঘের জন্ম হয় নি!

লোকটা ক্লাউন।

ক্লাউনদের সাধারণ মানুষ বলেই জানতুম। কিন্তু ক্লাউনের মেক-আপ নিয়েই যে কেউ মায়ের পেট থেকে জন্মায়—সত্যি বলতে কি, সে অভিজ্ঞতা এর আগে ছিল না। কান দুটো দেখুন—মানুষের এমন হয়? 'চিন' বলে কিছুই নেই। দু হাতে আবার বারোটা আঙুল—ওঃ, হরর!

আমি ঘুমের ভান করে পড়ে থাকলেও প্রত্যেকটি কথা শুনছিলুম ওদের।

ভগবানের রাজত্বে কত সৃষ্টিই আছে।

আমি গ্যারান্টি দিয়ে বলতে পারি, এর সৃষ্টি ভগবানের হাতে হয় নি। এ আলাদা ফ্যাক্টরির জিনিস। এর জন্যে যা কিছু ক্রেডিট তা শয়তানের পাওনা।

যেতে দিন। আমাদের বাঁচানো নিয়ে কথা।

একে মারে কে! শোনেন নি, বাঘকেই প্রায় স্ট্র্যাংগল্ করে ফেলেছিল?

এ সব কথা শুনতে কি আমার খারাপ লাগে? না। বরং গর্ব বোধ হয়। আমি আলাদা হয়েই জন্মেছি, আমি আলাদা জীব। ঈশ্বরের সৃষ্টিতে কারও সঙ্গে আমার কোন মিল নেই। এ আমার নিন্দা নয়, পরিচয়। আর এই পরিচয়ই তো জন্মের পর থেকে আমি চেয়ে এসেছি।

সব চাইতে বিপদে পড়ত নার্সরা, যখন ঘা-টা তারা ধুয়ে পরিষ্কার করে দিতে আসত। যন্ত্রণায় সুড়সুড়ি লাগত, আমি খিলখিল করে হেসে উঠতুম। চমকে এ ওর দিকে চাওয়া-চাওয়ি করত নার্সরা। যে অবস্থায় মানুষ চিৎকার করে, কেঁদে একাকার করে, সে অবস্থায় এমন করে কেউ যে হাসতে পারে এ ওরা স্বপ্নেও জানত না। প্রথম দিন একজন তো ভয়ে পালিয়েই গিয়েছিল সামনে থেকে।

পাগল! নিশ্চয় পাগল!

পাগল বইকি! সাধারণ মানুষের সঙ্গে যার মিল নেই সে-ই পাগল। সাধারণের মধ্যে যে অসাধারণ হয়ে জন্মায়, লোকে তাকেই পাগল বলে। না, আমার রাগ হয় না। বরং ওদের ভয় দেখে আরও বেশী করে হেসে উঠে ভয় পাইয়ে দিতে ইচ্ছে করে।

কিন্তু একদিন আমার হাসির মুখে পড়ল এসে প্রথম বাধা।

খবর নিতে অনেকেই আসত সার্কাস থেকে। সেদিন পদ্মাও এল ম্যানেজারের সঙ্গে।

ডাক্তারের কাছে কি বলবার জন্যে আমার কাছ থেকে উঠে গিয়েছিল ম্যানেজার। হাসপাতালের ইমার্জেন্সি ওয়ার্ডে সেদিন আমি ছাড়া আর একজন পেসেণ্ট ছিল—একটা অপারেশনের পর সে ঘুমোচ্ছিল ক্লোরোফর্মের নেশায়। সেই মুহূর্তে নার্সরাও কেউ ঘরে ছিল না। শুধু আমার বিছানায় কাছে একা বসে ছিল পদ্মা।

পদ্মার চোখের দিকে আমি চাইলুম। করুণ, গম্ভীর তার চোখ। সে চোখে হাসি নেই।

আমি আস্তে আস্তে বললুম, আমাকে আরও অদ্ভুত দেখাচ্ছে, না? তোমার খুব হাসি পাচ্ছে, না?

না।

এতদিন পদ্মার সঙ্গে আমি কখনও ভাল করে কথা বলতে পারি নি। আজ, এই হাসপাতালের বিছানায় শুয়ে আমার নিজের সব চাইতে গোপন কথাটা ওকে বলতে ইচ্ছে করল।

আমাকে দেখে যখন তুমি হাস, তখন আমার খুব ভাল লাগে।

পদ্মা চুপ করে বসে রইল। ওর দুটো কালো, রাত্রি-মাখানো চোখ কিছুক্ষণ থমকে রইল আমার মুখের ওপর। তারপর পদ্মা আস্তে আস্তে বলল,

জান, বাঘের খাঁচা খুলে দিয়েছিল কে?

না।

বিঠু। সেইদিন থেকেই সে পালিয়েছে। তার আর খবর নেই।

বিঠু!

আমি আশ্চর্য হলুম না। বরং এমনি একটা অনুমানই আমার মনে ছায়া ফেলেছিল। আমি ওর সাপের মত পলকহীন চোখ দুটো দেখেছি। জানি, ও আমাকে সহজে ছেড়ে দেবে না।

পদ্মা বলল, আমাকে বাঁচাতে গিয়ে তুমি মরতে বসেছিলে। আর তার ভেতরেও হাসছিলে হা-হা করে। তুমি কি মানুষ?

বললুম, আমি ক্লাউন।

না, তুমি ক্লাউন নও।

তবে আমি রাক্ষস। আমার বাবা তা-ই বলত, স্কুলের মাস্টারেরা বলত, রাগ করে মহবুব মিঞাও বলত। হয় রাক্ষস, নইলে শয়তান।

তুমি রাক্ষস নও। শয়তানের অনেক ওপরে। হয়তো দেবতারও ওপরে।

পদ্মার গলার আওয়াজ যেন অনেক দূর থেকে ভেসে এল, চোখ দুটো প্রায় বুজে এল। তারপরেই ঘটল সেই ব্যাপারটা। আমার কুৎসিত কদর্য মুখের ওপর দুটি অপরূপ কোমল ঠোঁট নেমে এল পদ্মার।

দু সেকেণ্ড—মাত্র দু সেকেণ্ড। তার বেশী নয়। কিন্তু এর মধ্যেই যেন একটা ঝড় বয়ে গেল আমার ওপর দিয়ে। রক্তের নোনার চাইতেও আরও তীব্র, আরও উন্মাদ আস্বাদ আমার সমস্ত শিরাস্নায়ুর ভেতর দিয়ে বিদ্যুতের মত ছুটে গেল।

আর তখনই বাইরে শোনা গেল জুতোর শব্দ। ঘরে ঢুকল ম্যানেজার।

' ডাক্তার বলেছে, কয়েকদিনের মধ্যেই ছেড়ে দেবে তোমাকে। একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস পড়ল ম্যানেজারের ঃ আমরা তো মনে করেছিলুম, তোমাকে ফেলে রেখেই চলে যেতে না হয়। ওদিকে আবার মজঃফরপুর যেতে হবে, সেখানে সব ব্যবস্থা হয়ে গেছে, পাবলিসিটিও করা হচ্ছে নিয়মিত।

ম্যানেজার আরও কী বলেছিল আমি শুনতে পেলুম না। আমার সমস্ত চেতনা তখন বিভোর হয়ে গেছে। দু চোখ অন্ধ করে আমি পড়ে রইলুম। সেখানে দুটি ঠোঁটের স্বাদ ছাড়া আর কিছুই নেই। ওরা কখন চলে গেছে, তাও আমি জানতে পারি নি।

কলকাতার সেই সঙগুলোকে মনে পড়ছিল।

না, এ স্বাদ সেখানে নেই। হাসির সুড়সুড়ি ছাড়া তাদের আর কিছুই ছিল না। আর রাধা? আমার ঠোঁটে সাপের মতো বিষই ঢেলে দিতে পারে, তার সঙ্গে এর কোনো মিল নেই কোথাও।

সার্কাসে ফিরে এসেছি। আরও আলাদা, আরও ভয়ঙ্কর হয়ে।

এখন মুথুস্বামীর মত জোয়ান পর্যন্ত আমাকে ভয় করে। জাপানী জোশিদো যেচে আমার সঙ্গে আলাপ করে গেল। রাধার চোখ এখন ঝকমক করছে একটা আশ্চর্য আলোয়—সে দেখেছে তার কালা কান্‌হাইয়া সত্যি সত্যিই কী ভয়ঙ্কর—কী অমানুষিক হিংস্রতায় গড়া তার শরীর।

হফম্যান এসে আমার হাত ঝাঁকিয়ে বলল, কন্‌গ্র্যাচুলেশনস!

ম্যাথু কিছুক্ষণ মিটমিট করে তাকিয়ে রইল আমার দিকে। বলল, খুব নার্ভ আছে তোমার। শিকারী হওয়া উচিত ছিল। জান একসময় আমিও আফ্রিকার জঙ্গলে শিকার করেছি। একবার একটা লেপার্ডের সঙ্গে আমাকেও খুব ধস্তাধস্তি করতে হয়েছিল।

অর্থাৎ, আমার এমন কিছু কৃতিত্ব নেই। ও-কাজটা ম্যাথুও পারত।

আর দু-একদিন পরেই আমার কাছে মুখ খুলল সাইক্লিস্ট হরেন দাস। সার্কাসে মোহন পাণ্ডে যার নাম।

সেদিনও অনেক রাত্রে ওর সেই কান্নার গান শুনছিলুম। তারপর পাশের ক্যাম্পখাটে যখন সুব্বারাও ঘুমে অচেতন, তখন তাঁবুর পরদা তুলে হরেন দাস ডাকল, মুরারি!

খুব আস্তে আস্তে ডেকেছিল। তবু ওই নামটা শুনে আধো-ঘুম থেকে আমি চমকে উঠলুম। হঠাৎ যেন মনে হল, অনেক দূর থেকে ছেলেবেলার আনন্দ আমাকে ডাকছে।

কেমন যেন ঝিমঝিম করে উঠল মাথার ভেতর; এই তাঁবু—এই রাত—সব যেন কেমন অবাস্তব বলে মনে হল।

হরেন দাস বলল, ঘুমুচ্ছ?

না।

তবে বাইরে এস। কথা আছে।

যে মাঠে আমাদের তাঁবু পড়েছিল, তার আশপাশে লোকালয় নেই। চারদিক ফাঁকা তার মধ্যে ঠাণ্ডা হাওয়া বয়ে চলেছে। আকাশে চাঁদ জ্যোৎস্নার

ঢেউ বয়ে যাচ্ছে।

একটা কাঠের খুঁটি পড়ে ছিল। বলল বস।

দুজনে বসলুম পাশাপাশি।

মিনিট কয়েক চুপ করে রইল হরেন দাস। তারপর বলল, আমিও গলা টিপে খুন করেছিলুম। তবে বাঘিনীকে।

বাঘিনী! অবাক বিস্ময়ে আমি ওর দিকে চেয়ে রইলুম।

আমার বউ। অদ্ভুত সুন্দর ছিল দেখতে। কিন্তু ভেতরে তার সাপ লুকনো ছিল। আমি সাবানের এজেন্সি করতুম। প্রায়ই যেতে হত বাইরে। হঠাৎ একদিন অসময়ে ফিরে এসে দেখি—

হরেন দাস একবার থামল। গলাটা ধরে এসেছিল পরিষ্কার করে নিয়ে বলল, লোকটা ছুটে পালাল। আর বউটা কিছু বলবার আগেই দু হাতে তার গলা টিপে ধরলুম। একটু বাধা দিলে না, একবার হাতপা ছুড়ল না পর্যন্ত। একতাল কাদার মত যেন গলে গেল গলাটা, ঠোঁট আর নাক দিয়ে রক্ত গড়িয়ে আমার হাতে লাগল। তারপরেই মিটে গেল সমস্ত।

তুমি খুনী! আমি আবার চমকে উঠলুম। মহবুব মিঞাকে আমার মনে পড়ে গেল।

হ্যাঁ, খুনী।—হরেন দাস আস্তে আস্তে বলল, কিন্তু বউকে আমি বড় ভালবাসতুম। আজও ভালবাসি।

কিছুক্ষণ চুপচাপ। জ্যোৎস্নাধোয়া মাঠের ভেতর দিয়ে হাওয়া বইছিল, এতক্ষণ পরে যেন ঝিঁঝিরাও ডেকে উঠল একসঙ্গে।

খুন করে তুমি সার্কাসের দলে এসেছ।—কিছুক্ষণ পরে আমি বললুম সকলের চোখের সামনে—

সার্কাস তখন মালয় আর বর্মার পথে চলেছে। ঘুরে এল দেড় বছর পর। তখন ভেবেছিলুম, পালাই। কিন্তু পালিয়েই বা যাব কোথায়? তারপরে ভেবে দেখলুম, সকলের চোখের সামনে থাকাই সব চাইতে নিরাপদ। কেউ কোনদিন সন্দেহ করবে না।

আবার চুপচাপ। তারপর একটা ঘোড়া ডেকে উঠল। আর তক্ষুনি আচমকা উঠে দাঁড়াল হরেন দাস। আমার দিকে ভ্রূকুটি করে বলল, তোমাকে কেন বললুম এ-সব কথা? কোন দরকার ছিল না।

কিন্তু আমার দরকার ছিল। সে মুহূর্তে অবশ্য তা আমি বুঝতে

পারি নি। কেবল আরও অনেকক্ষণ সেই হু-হু করা হাওয়ায়, ঝিঁঝির ডাকের মধ্যে, সেই জ্যোৎস্নার আলোয় আমার মনে হতে লাগল, একটা নতুন কথা শুনছি। ভালবাসা। রাধার মুখে কথাটার কোনো অর্থ ছিল না—কিন্তু হরেন দাস যেন নতুন করে শব্দটা আমার কাছে এনে পৌঁছে দিয়েছে। পদ্মাকে আমি ভালবাসি।

সকলের ভিড়ের মাঝখানে ওকে আমি খুঁজে বেড়াতে লাগলুম পরদিন থেকে। দূরে থেকে দেখি, দেখি ওর চোখে বিদ্যুতের মত কী খেলে যায়। আমি আর হাসতে পারি না সহজে। কী যেন একটা দুলে দুলে ওঠে হৃৎপিণ্ডের ভেতর। কান্না?

না, কান্নার কথা ভাবতে পারি না। যেদিন আমার কান্না—সেইদিনই আমার মৃত্যু।

ভোরবেলা উঠেছি ট্র্যাপিজে। তাঁবুর মধ্যে তখনও লোক এসে হাজির হয়নি।

বড় আলোটা জ্বলছে, আমি ট্র্যাপিজে দোল খেয়ে চলেছি একলা। ভাবছি, পদ্মার শরীরটা এরই ওপরে দুলতে থাকে—হাওয়ার ওপর দিয়ে ভেসে যায়। ওর দেহের প্রত্যেকটা রেখা যেন আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিলুম।

আর ঠিক সেই সময় উল্টো দিকের দড়ি বেয়ে পদ্মা ট্র্যাপিজে উঠে এল।

স্বপ্ন দেখছি? না, পদ্মাই বটে। সেই শরীর—সেই বিদ্যুতে-ভরা চোখ, ঠোঁটের কোণে সেই হাসির আভাস। আমার মাথায় রক্ত ছুটতে লাগল।

পদ্মা বলল লাগাও খেল্। দেখি, কেমন খেলোয়াড় হয়েছ তুমি।

দু দিক থেকে ট্র্যাপিজে দোল লাগল। আমার মনে হতে লাগল, আজ আমার শরীরটাও পদ্মার মত হালকা হয়ে গেছে—হয়তো পদ্মার চাইতেও বেশী। এখন যদি নিজেকে এই ট্র্যাপিজ থেকে আমি ছেড়ে দিই তা হলে মাটিতে পড়ব না—হাওয়ায় ভাসতে ভাসতে উড়ে যাব। এই তাঁবু ছাড়িয়ে, এই শহর ছাড়িয়ে কোথায়—কতদূরে, আমি জানি না।

প্রলয়-দোলায় আমি দুলে চললুম। পদ্মা যেন একবার চিৎকার করে বলল, সাবাস্—সাবাস্—

তারপর ওদিক থেকে আর একটা প্রলয়-দোলা ছুটে এল। দুটো ঝড় মিশল একসঙ্গে। আর সেই মহাশূন্যে, সেই দোলার মাঝখানে পদ্মার

ঠোঁট এসে মিশল আমার ঠোঁটে—এক মুহূর্তের জন্যে আমাদের দুটো দেহ একসঙ্গে জড়িয়ে গেল।

নীচে নেট ছিল না। অথচ, সেই মুহূর্তেই আমি আছড়ে পড়ে পারতুম। নিজের রক্তের চাইতেও আরও মাতাল করা স্বাদে, রাধার চাইতে লক্ষ গুণ আগ্নেয় চমকে আমার শরীর যেন মুহূর্তে নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিল। অথচ আমি পড়লুম না। কেমন করে যে ধরে রইলুম তা জানি না—চেতনাই যেন ছিল না কোথাও।

আর নীচ থেকে একটা ক্রুদ্ধ গর্জন ছুটে এল তখন। বাঘের চাইতেও ক্ষুধিত, সিংহের চাইতেও নিষ্ঠুর।

উতার আও—উতার আও বাঁদী কী বাচ্চা—

ম্যানেজার। যেন থাবা পেতে দাঁড়িয়ে আছে।

উতারো বাঁদী কী বাচ্চী!

নেমে এলুম। তখনও আশ্চর্য আস্বাদে ভরা আমার শরীর। তখনও নিজের মধ্যে আমি ডুবে আছি। পৃথিবীতে কাউকে আমি দেখতে পাচ্ছি না--কাউকে আমার ভয় নেই। মানেজার তো সামান্য!

আর পদ্মা হেসে উঠল খিলখিলিয়ে।

একটা ক্লাউনের সঙ্গে ঠাট্টা করছিলুম। ঠাট্টাও বোঝ না তুমি।

আমি তখনও মাটিতে পা দিই নি। শুনোই আমার শরীরটা থমকে গেল। এই তিন বছরে আমি তামিল ভাষা বুঝতে পারি।

মানেজার গর্জন করে বলল, এসব ঠাট্টা তোমাকে বন্ধ করতে হবে এখন, আগে যা চলে চলত। ভুলে যেয়ো না এক মাস আগে তোমার সঙ্গে আমার বিয়ে হয়ে গেছে!

এক মাস আগে! যখন আমি হাসপাতালে ছিলুম।

তারপর মানেজার ছুটে এল আমার দিকে। আমি মাটিতে পড়ে যাওয়ার আগেই সে একটা প্রচণ্ড ঘুষি বসিয়ে দিল আমার মুখে। বেশ টের পেলুম, দুটো দাঁত আমার খসে গেছে, আমার মুখে রক্তের নোনা আস্বাদ।

হা হা করে হাসতে চাইলুম, হাসি এল না। এক মুহূর্তে আমার হাসির যন্ত্রের তার ছিঁড়ে গেছে। আর একটা লাথি পড়ল পেটের ওপর, আমি মুখ থুবড়ে পড়ে গেলুম।

বাঁদী কী বাচ্চা! উল্লুক—রাস্কেল্—জানবর কাঁহাকা!

না, কিছুতেই আমি আর হাসতে পারছি না। পিঠের ওপর লাথির পর লাথি পড়ছে. যন্ত্রণায় টুকরো টুকরো হয়ে যাচ্ছে শরীর, তবু হাসি আসছে না আমার। মুখ দিয়ে অদ্ভুত একটা আওয়াজ বেরুচ্ছে, বুকটা যেন ভেঙে গুঁড়ো হয়ে যাবে এখুনি।

আমি কি কাঁদছি? আমি কাঁদছি?

॥ এগারো ॥

নাঃ, কাঁদবনা। কাঁদবার জন্যে আমার জন্ম হয় নি। চোখের জল বেরিয়ে আসতে-না-আসতেই কখন নিঃশেষে শুকিয়ে গেছে। আমি জেনেছি। সব আমার জানা হয়ে গেছে। পদ্মা এখন অনেক দূরে। সেদিন হাসপাতালে একবারের জন্যে আমার ঠোঁটের ওপর তার ঠোঁট নেমেছিল। সে কৃতজ্ঞতা। আমি তার প্রাণ বাঁচিয়েছিলুম, তার পারিশ্রমিক।

কালকে ভোর রাত্রে সেই ট্র্যাপিজের দোল। সেই শূন্য দিয়ে তীরের মতো উড়ে আসা দুটো শরীর। কয়েকটা মুহূর্তের ছোঁয়া। ঠোঁটে ঠোঁটে আবার বিদ্যুৎ জ্বলে ওঠা। একদিক থেকে ফুল্কি আর দিক থেকে হাওয়া। তারপর হাওয়ায় আর ফুল্কিতে মিলে একটা দীর্ঘায়ত শিখা। আগুন। সমস্তটাই আগ্নেয়।

এই সার্কাসের তাঁবুটা কোথাও নেই, সারি সারি গ্যালারী অনেকগুলো সিঁড়ির মতো ওপরে উঠতে উঠতে হঠাৎ যেন মিলিয়ে গেছে—যেন তার শেষ ধাপটা এসে সেইখানেই পৌঁছেছে যেখানে অনন্ত আকাশ জুড়ে আগুনের খেলা ছাড়া আর কিছুই নেই। স্কুলে পড়বার সময় বলতেন ভূগোলের মাস্টার ভূপালবাবু। আকাশটা অসীম শূন্য, এত শূন্য—এমন অন্ধকার—এত বিশাল যে মানুষ তা ধারণাতেও আনতে পারে না। আর সেই অনন্ত শূন্যে—দুর্ভেদ্য কৃষ্ণতার ভেতর সারি সারি সূর্যের লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি মাইল জোড়া চিতা জ্বলছে; লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি অদৃশ্য ট্র্যাপিজের দড়িতে বাঁধা সেই চিতারা ঘুরছে—অনন্ত দোলায় দোল খাচ্ছে। কখনো কখনো সেই ভয়ঙ্কর দোলায় দুলতে দুলতে তারা এসে এ ওর সঙ্গে মিলে যাচ্ছে—দুটো বিরাট আগুন পরিণত হচ্ছে প্রলয়ের বিস্ফোরণে—শূন্যতার বুকে রাশি রাশি জ্বলন্ত ধাতুর ফুলঝুরি ছড়িয়ে দিয়ে আর একটা মহাচিতা লাল-নীল-বেগুনে শিখার

পাপড়ি মেলে দিচ্ছে।

আমি আর পদ্মা। সেই ঝাপ্সা অন্ধকারে ভরা তাঁবু। সেই ট্র্যাপিজের দোল। দুটো সূর্যের মতো শূন্যের পথ দিয়ে ঘুরতে ঘুরতে দুলতে দুলতে এসে মিলেছিলুম। তারপর।

ম্যানেজার। উতার আও—উতার আও। কুত্তা। জান্‌বর কাঁহাকা। বাঁদীকী বাচ্চা। মুখের ওপর চাবুকের ঘা। একটা অতল সমুদ্র। সেখানে আলো নেই—তলা নেই। ডুবতে থাকি। ডুবেই চলি। কখন জানি না—ধীরে ধীরে আবার ভেসে উঠি চেতনার রেখায়। কয়েকটা বুদ্বুদের মতো জীবনটা ফুটে ওঠে আশে পাশে। স্মৃতি-পরিচয়-পরিবেশ। আলো। আমি। ম্যানেজার। তাঁবুটা। পদ্মা কোথাও নেই—সে পালিয়েছে। তার গায়েও দু-এক ঘা চাবুক পড়েছে কিনা কে জানে!

হাত ধরে হিংস্র একটা টান দিয়ে দাঁড় করায় ম্যানেজার। হাজারীবাগের জঙ্গল থেকে আনা যে বাঘটার আমি গলা টিপে মেরেছিলুম তার চাইতেও নিষ্ঠুর হিংসায় জ্বলতে থাকে ম্যানেজারের চোখ।

'ফের যদি বদ্‌মায়েসী দেখি গুলি করে মেরে দেব। বেইমান—বাঁদী কী বাচ্চা।'

বাঘটাকে বলতে গেলে, আমিই মেরেছিলুম। ম্যানেজারকে পারি না। তারও বুকের ওপর চেপে বসে দুহাতে গলাটা পিষতে পিষতে আর তার ধারালো নখের আঁচড়ে ক্ষত-বিক্ষত হতে হতে আমি হা-হা করে হেসে উঠতে পারি না তো। আমি জানি, ম্যানেজারের সঙ্গে প্রায় সব সময় গুলি-ভরা রিভলভার থাকে। জানোয়ার নিয়ে যার কারবার, সদা সর্বদা তৈরি রিভলভার না রাখলে তার চলে না। সে রিভলভারের খবর আমি রাখি। আমার উনিশ বছরের শরীরে দৈত্যের মতো শক্তি নিয়ে, দু হাতের দুটো করে বাড়্‌তি আঙুলেও ম্যানেজারকে খুন করবার সামর্থ্য আমার নেই। যেমন সব চাইতে বড়, সব চেয়ে বেয়াড়া প্রকাণ্ড কেশরওয়ালা সিংহটাও ম্যানেজারের চাবুকের সামনে পোষা কুকুরের মতো পা ভাঁজ করে কোমর ভেঙে লুটিয়ে পড়ে, আমিও ঠিক তাই। তার চাইতে বেশি আমি কিছুই পারি না। এতটুকুও নয়।

গ্যালারীর ধাপগুলো সত্যিই কিছু আকাশে গিয়ে পৌঁছোয় না—কয়েক হাত উঠেই অসহায়ভাবে থমকে যায়। তার ওপরে চেপে বসে কতগুলো অতি

তুচ্ছ মানুষ—পাঁচ বছরের ছেলে থেকে সত্তর বছরের বুড়ো পর্যন্ত। তারা বিড়ি খায়, গ্যালারীর ফাঁকের ভেতর দিয়ে পানের পীচ ফেলে, কড়মড় করে চীনে বাদামের খোলা ভাঙে। কাকাতুয়ার কামান ছোড়া দেখে তারা সাবাস সাবাস বলে চেঁচিয়ে ওঠে—ক্লাউনের খেলা দেখে হেসে গড়াগড়ি যায়।

সব ওই গ্যালারীর ধাপের মতো। তুচ্ছতার মধ্যে ফুরিয়ে যাওয়া। সূর্য না—আকাশ না—অনন্ত শূন্য না। যেখানে লক্ষ লক্ষ অদৃশ্য ট্র্যাপিজের দড়িতে বাঁধা পড়ে লক্ষ লক্ষ মধ্যাচিতা পাক খাচ্ছে, দুলছে প্রলয়ঙ্কর দোলায়—সে আমার কাছ থেকে অনেক দূরে। আমি ঠিকরে উঠেছিলুম হাউইয়ের মতো—আমার বারুদে আগুন ছুঁইয়েছিল ম্যানেজার পদ্মা এসেছিল একটা ঝোড়ো হাওয়ার দমক নিয়ে—কিন্তু তার পরেই মাটিতে ঠিকরে পড়লুম দেখতে না দেখতে।

হাউই। বারুদ ফুরিয়ে গেলে মাটিতে আছড়ে পড়ে। যে হাসির বারুদ দিয়ে আমি তৈরি হয়েছিলুম, সেটাও কি পুড়ে শেষ হয়ে গেছে? আমি কি এখন একটা পোড়া খোলস ছাড়া আর কিছুই নই? তাই কি নিজের আনন্দে আর আমি তেমন করে হেসে উঠতে পারি না—ঘা খেলে এখন মুখ গুঁজে গুমরে গুমরে কাঁদতে ইচ্ছে করে? যেমন লাথি খেয়ে কেঁউ কেঁউ করে কাঁদে অঙ্ক-কষা কুকুরটা- যেমনভাবে চাবুক খেয়ে তেজী ঘোড়াগুলো পা আছড়ায়?

রাত দেড়টা দুটোর কাছাকাছি হবে। কম্বল সরিয়ে আমি উঠে বসলুম। তাঁবুর ভেতরে কন্‌কনে ঠান্ডা। নিচের মাটির মেঝেতে যেন বরফের কুচি ছড়ানো। বাইরে বাতাসের আওয়াজ। উত্তর-পুব কোণায় কয়েকটা সেগুন গাছকে দেখেছি জড়াজড়ি করে দাঁড়িয়ে থাকতে—সেখান থেকে পাতা ঝরবার শব্দ পাচ্ছি। ঠিক খস্‌খস্‌ করে কর্কশ চাপা হাসির মতো শব্দটা। রাত্রি হাসছে। বিদূষকের হাসি ফুরিয়ে যাওয়া দেখে ব্যঙ্গের হাসি হেসে চলেছে।

সুব্বা রাওয়ের নাক ডাকছে। শুতে না শুতেই ওর নাক ডাকে। যেন সার্কাসের বাঘ-সিংহের সঙ্গে সারারাত ধরে ডাকের পাল্লা দেয়। হঠাৎ মনে হল, সার্কাসের এই পশুগুলোর সঙ্গে তো আমাদের কারো কোনো তফাৎ নেই। চাবুকের ছটাছট্‌ আওয়াজ শুনে যেমন করে ঘোড়াগুলো রিংয়ের চারদিকে পাগলের মতো ছুটতে থাকে; হাতের ইঙ্গিতে কুকুরেরা যেমন করে পায়ের তলায় আসে যায় কিংবা সংখ্যা-লেখা চাক্তিগুলো কুড়িয়ে নিয়ে যোগফল কষে; অথবা আফ্রিকার ভয়ঙ্কর সিংহগুলো একদল অতি বাধ্য পাঠশালার ছাত্রের

মতো যেমনভাবে কাঠের টুলগুলোর ওপর পা তুলে উঠে দাঁড়ায়—আমরাও ঠিক তেমনি করে ম্যানেজারের চাবুকের ভয়ে ওঠা-বসা করছি। কেউ খেলা দেখাই, কেউ হাসাই।

অথচ, ম্যানেজার আমাকে বলেছিল, 'মানুষ হয়ে বাঁচো। গোরার লাথি খেয়ে ভিক্ষে করতে লজ্জা হয় না?'

না—ম্যানেজারও আমাকে মানুষ করেনি। ক্লাউন বানিয়েছে। এই সার্কাসের ঘোড়া, কুকুর—কাকাতুয়ার সঙ্গে আমার কোনো তফাৎ নেই। পদ্মা আমার কাছ থেকে অনেক দূরে।

সেই কার মুখে যেন গাধার স্বপ্নের গল্পটা শুনেছিলুম। সেই পুরোনো মহবুবের আড্ডায়।

সার্কাসের গাধাকে আর একটা গাধা বন্ধুভাবে বলেছিল, কেন ওখানে পড়ে থেকে অমন করে মার খাও রোজ রোজ? পালিয়ে এলেই তো পাবো।

সার্কাসের গাধা বলেছিল, পাগল! পালাব কি! ভবিষ্যতের কতখানি আশা নিয়ে আমি আছি -তা জানো?

—কী তোমার ভবিষ্যতের আশা? খুলে বলো তো- শুনি?

—সার্কাসের মালিকের একটি মেয়ে আছে। আহা -কী তার রূপ! বলতে বলতে আবেগে গাধার চাবুকের কালশিটে পড়া শরীর রোমাঞ্চিত হয়ে উঠেছিল, বুজে এসেছিল গলার স্বরঃ দুধে-আলতার রং, কী টিকোলো নাক—কী মুখ! তার সঙ্গে আমার বিয়ে হবে। সেই শুভদিনটির জন্যেই অপেক্ষা করছি আমি।

—সেকি! অমন মেয়ের কেন বিয়ে দেবে তোমার মতো আধবুড়ো গাধার সঙ্গে?

—দেবে, দেবে। মেয়েটা দড়ির ওপর খেলা দেখায়। মধ্যে মধ্যে পা কাঁপে। মালিক বলে, হুঁশিয়ারসে চল্। যদি পা ফসকে নিচে পড়বি তো এই গাধার সঙ্গে তোর সাদী দিয়ে দেব। আরে ভাই, আজ হোক কাল হোক পড়বেই তো একদিন। তখন আর আমায় পায় কে! মালিকের দামাদ হয়ে—অমন খাসা বউ নিয়ে রাজার মাফিক দিন কাটাব। দেখে নিয়ো তখন।

আমিও ওই গাধাটার মতো স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছিলুম। আজ স্বপ্নের শেষ। পদ্মার সঙ্গে ম্যানেজারের বিয়ে হয়ে গেছে।

গলাটা শুকিয়ে খরখর করছে। যেন একমুঠো ধারালো বালি ছড়ানো রয়েছে সেখানে। মেজেতে একখানা পা নামিয়েছিলুম ঠাণ্ডা মাটি থেকে যেন

কতগুলো বরফের কাঁটা বিঁধছে পায়ের তলায়। বাইরে শীতের বাতাস। তাঁবুর উত্তর-পশ্চিম দিকটা পত্‌পত্‌ করে কাঁপছে। সেগুন গাছগুলো থেকে খসখসে কর্কশ হাসির আওয়াজ তুলে পাতা ঝরছে—রাত্রিটা হাসছে। গাধার স্বপ্নের পরিণামটা দেখছে সকৌতুকে।

নিজেকে ব্যঙ্গ করে হেসে উঠতে চাইলুম। হাসি আসছে না। গলায় কাঁকরমেশানো বালির যন্ত্রণা। একটু জল খাওয়া দরকার। ঠোঁটদুটোকে কে যেন আঠা দিয়ে সেঁটে দিয়েছে ব'লে মনে হচ্ছে।

এক কোণায় কালো সোরাইটা হিম মেখে ভূতুড়ে হয়ে বসে আছে। এগিয়ে গেলুম সেদিকে। সেটাকে দুহাতে তুলে বরফ-গলা জল খেলুম আকণ্ঠ। সারা শরীর ঝেঁকে উঠল গুরগুরিয়ে উঠল পেটের ভেতর বুকে যেন কয়েকটা ধাক্কা লাগল। ঠোঁটের পাশ দিয়ে এক ফোঁটা জল গলায় পড়েছিল, সেটা সাপের মতো সিরসিরিয়ে নামতে লাগল নিচের দিকে। একবার ইচ্ছে হল জলের ফোঁটাটাকে মুছে ফেলি, কিন্তু ওর নিষ্ঠুর সঞ্চারটা আমার শরীরে যন্ত্রণাময় আনন্দের অভ্যস্ত অনুভূতিটাকে যেন সুড়সুড়ি দিতে লাগল।

আমি নিজের খাটিয়ায় ফিরে এলুম। জলের ফোঁটাটা প্রেতের শীতল আঙুলের ছোঁয়া টানতে টানতে কোথায় কখন এসে থমকে গেল জানি না। আমি কম্বলটাকে জড়িয়ে নিয়ে খাটিয়ার ওপর উঠে বসলুম। বাঁ-পায়ের খানিকটা পাতা বেরিয়ে আছে বাইরে শীতে জমে আসতে চাইছে, আঙুল-গুলোর ওপর দিয়ে যেন ছুরি চলছে। কিন্তু পা-টা ঢাকতে আমার উৎসাহ হল না। মনে হল ওই যন্ত্রণাটা আমার সঙ্গে জেগে থাকুক। আমি নিজেকে খানিকটা স্বাভাবিক বোধ করব।

জলের ফোঁটাটা কোথায় হারিয়ে গেছে জানি না; কিন্তু তার ছোঁয়াটা আছে। আর মনে পড়ছে, মহবুব মিঞার আড্ডার একটা বাঙাল ছেলে পদ্মা নদীর কথা বলেছিল। সে নদী কলকাতার গঙ্গার চাইতে পাঁচগুণ সাতগুণ বড়—তার ওপার দেখা যায় না—কেবল শাদা জল ধু-ধু করতে থাকে। সেই পদ্মায় যখন তুফান ওঠে তখন ছোট ছোট নৌকো এক মুহূর্তে উলটে যায়—চক্ষের পলকে তলিয়ে যায় প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড স্টিমার। আবার জ্যোৎস্নায় সে নদী নিথর হয়ে এলিয়ে পড়ে—মনে হয় একটি ঘুমন্ত মেয়ের শরীর—ছোট ছোট ঢেউগুলো যেন তার বুকের মতো নিঃশ্বাসে নিঃশ্বাসে কাঁপতে থাকে।

আ-ঢাকা পায়ের পাতাটা ঠাণ্ডায় জ্বালা করছে—যেন কেউ ছুরি চালাচ্ছে।

আঙুলগুলোর ওপরে। হঠাৎ আবিষ্কার করলুম, আমার পাঁজরার শুকিয়ে যাওয়া বাঘের দাঁতের ক্ষতটাও যেন সেই যন্ত্রণার সঙ্গে অদ্ভুত সুর মিলিয়েছে একটা। আর এই দুটো যন্ত্রণার মিশ্র রাগিণীতে আমি অনেক সহজ—অনেক স্বাভাবিক হয়ে উঠেছি। আমি আর বিদূষক নই। আমি যেন সেই মুরারি—যে সেকেন্ড মাস্টারকে এক মুহূর্তে ধরাশায়ী করে দিয়েছিল, যার হিংস্র ধারালো দাঁতের ছোঁয়া পেয়ে স্বয়ং মহবুব মিঞা পর্যন্ত যাকে ঘাঁটাতে সাহস পেত না—হাজারীবাগের বাঘটা নিজের শ্বাসনলীর ওপর যার থাবার চাপ পেতে পেতে অনুভব করেছিল—বন্য হিংসার চাইতেও বন্যতর শক্তি পৃথিবীতে আছে।

পদ্মা। পদ্মা নদী সে নয়। ওপার দেখা যায়না এমন রহস্য তার মধ্যে কোথাও নেই। নিতান্তই একটা মেয়ে। আগুন না—সূর্য না—মহাশূন্য না—কোনো অনন্ত ট্র্যাপিজের প্রলয়দোলায় সে দোল খাচ্ছে না। আমার এই লোহার মতো শক্ত শরীরে—দুটো বাহুর বাঁধনের ভেতরে ঘোড়ার খেলা দেখানো দুঃসাহসিনী রাধা পর্যন্ত যেমনভাবে একতাল মাখনের মতো মিলিয়ে যায়—পদ্মাও তাই যাবে। রাত্রির অন্ধকারে রাধার জায়গায় পদ্মা এসে ধরা দিলে কোনো তফাৎ বোঝা যাবে না—সব একরকম—সব যে-কোনো একটি মেয়ের শরীর ছাড়া আর কিছুই নয়।

তবে কেন পদ্মার জন্যে আমি এমনভাবে পাগল হয়ে উঠছি?

মনে আছে, কয়েক মাস আগে এক নবাব বাহাদুরের মস্ত বাড়ীর ভেতরের উঠোনে স্পেশ্যাল খেলা দেখাতে হয়েছিল। দু'রাত। প্রথম রাতে নবাব এলেন তাঁর বন্ধু-বান্ধবদের নিয়ে। দ্বিতীয় রাতে কেবল মেয়েদের জন্যে ব্যবস্থা। বেগমেরা, নবাবজাদীরা, বাঁদীরা সবাই খেলা দেখবে সেদিন। একটি পুরুষ থাকবে না কোথাও। কড়া পর্দার ব্যবস্থা নবাব পরিবারে. দূরে বিদেশে যা খুশি করো. এখানে পুরোনো নিয়মের একতিলও অদল-বদল করা চলবে না।

দর্শকদের দিকে তাকিয়ে আমার যেমন অবাক লেগেছিল, হাসিও পেয়েছিল তেমনি। দু-চারটি ছোট ছোট মেয়ে ছাড়া সব বোরখায় জড়ানো -গোঁড়া মুসলমানের বাড়ীতে ন-দশ বছর বয়েসের পরেই পর্দা হয়ে যায় মেয়েদের। সামনের দিকে যাঁরা বসে ছিলেন, ঝলমলে বোরখায় যাঁদের চোখমুখ ঢাকা ছিল, খুব সম্ভব তাঁরাই বেগম আর নবাবজাদীর দল; তাঁদের কারো মেহেদী রাঙানো আঙুলে হীরের আংটি ঝিলিক দিচ্ছিল, কারো হাতে ঝিলমিল

করছিল দামি সোনার গয়না; কিন্তু হাতের ওই ফর্সা শাম্‌লা কালো রঙ আর দামি গয়না আংটি বাদ দিলে কী তফাৎ—কতটুকু ফারাক? সব ক'টিই মেয়ে ছাড়া আর কিছু নয়—সবাই এক জাতের। যাঁহা বেগম—তাঁহা বাঁদী।

রাধা আমার কানে কানে বলেছিল, তুম্‌হারা সাথ মেরী শাদী হো গয়ী।

পদ্মার সঙ্গে রাধার তফাৎ কোথায়? চেহারায়? সেও তো বোরখা ছাড়া আর কিছু নয়। ওই চামড়ার বোরখা সরিয়ে দিলে সব একরকম। আমি দেখেছি। আরো বেশি করে দেখেছি চিতার আগুনে। মানুষ যখন পোড়ে তখন তাকে কালো একটা রবারের পুতুলের মতো মনে হয়। সেখানে কুৎসিত কদাকার আমার সঙ্গে অমন সুপুরুষ চিন্নুর কোনো পার্থক্য নেই।

রাধা তা জানে। তাই চিন্নুর সঙ্গে তার বিয়ের কথা চালু থাকলেও সে ছুটে এসেছে আমার কাছে। রাত্রির অন্ধকারে দুটো বুনো জন্তু পরস্পরকে চায়। কেমন চেহারা—কী রঙ—এ সব ভাবনা একেবারেই মিথ্যে মনে হয় তখন।

আমার রাধা থাক। অনাবৃত পা আর পাঁজরার যন্ত্রণার মিশ্র রাগিণীতে আমার মনে সুর উঠতে লাগল : আমার রাধাই থাক। পদ্মার সঙ্গে তার কোনো তফাৎ নেই।

সত্যিই নেই?

কিন্তু আর ভাবতে পারি না। গলার ভেতরটা আবার শুকিয়ে উঠতে চাইছে। রাত ক'টা বাজল কে জানে। হাওয়ায় হাওয়ায় খসখসে হাসির কর্কশ আওয়াজ তুলে সেগুনের পাতা ঝরে চলেছে। সুব্বা রাওয়ের নাক ডাকছে একটানা। যে-সব বাঘেরা সুন্দরবনের কথা ভেবে গুমরে উঠছে, যে সিংহেরা স্বপ্নে আফ্রিকার জঙ্গলে সঙ্গীদের ডাকে সাড়া দিচ্ছে তাদের সঙ্গে সমানে সুর মেলাচ্ছে সুব্বা রাও। ম্যানেজারের চাবুকের বাহাদুরী আছে। আমরা জন্তু হয়ে গেছি। আমরা সবাই।

কখন ঘুমিয়ে পড়েছি জানি না। জানি না কম্বল দিয়ে পা ঢেকে আবার কখন লম্বা হয়ে পড়েছি নিজের খাটিয়ার ওপর। আর ঘুমের মধ্যে স্বপ্ন দেখেছি।

স্বপ্ন দেখেছি ছেলেবেলার।

পূর্ণিমার চাঁদ উঠেছে আকাশে। জানলার বাইরে একটা রাত-জাগা

পাখি ডাকছে একটানা। বাতাসে জ্যোৎস্না রাতের গন্ধ—ঘুমন্ত পাতার, ফুলের কুঁড়ির, ফড়িঙের মুড়ে রাখা ডানার,ঘাসের শিশিরের মাটির।

পাশে যেন পিসিমা ঘুমুচ্ছে। বোজা চোখের কোণায় জল। মাথার কাছে রামায়ণ। সীতার বনবাসের কথা পড়তে পড়তে পিসিমা কাঁদছিল—ঘুমের ঘোরেও আমি যেন টের পাচ্ছিলুম।

পিসিমার মুখের ওপর চাঁদের আলো। বাইরে জোৎস্না রাত্রির গন্ধ। রামায়ণের পাতা খোলা—অক্ষরগুলো পড়তে পারব মনে হয় কিন্তু চেষ্টা করেও পড়া যায় না। বাইবে রাত-জাগা পাখিটা একটানা ডাকছে। অদ্ভুত সে ডাক।

আমার মন কেমন করে উঠল। বিছানা ছেড়ে উঠে এলুম। দরজা খুলে পা দিলুম বাইরে।

এগিয়ে চলেছি তো চলেইছি। পায়ের নিচে জ্যোৎস্নায় ধোয়া পথ। শিশিরে ভেজা ধুলো আমার গোড়ালি পর্যন্ত জড়িয়ে যাচ্ছে। মাথার ওপর দিয়ে ডাকতে ডাকতে চলেছে পাখিটা—যেন আমাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে চলেছে।

কতটা হেঁটেছি জানি না। হঠাৎ দেখলুম. সামনে তালদীঘি।

তালদীঘি। অনেক দূরে—মাঠের মাঝখানে। শুনেছিলুম. ও দীঘি বহুকালের পুরোনো। ওখানে আগে ঠ্যাঙাড়েরা মানুষ খুন করত। তাল-দীঘির কাদার তলায় নাকি এখনো মানুষের মাথা হাড় আর মেটে হাঁড়িতে যখের ধনের সন্ধান মেলে। এ দীঘির ধারে আমরা কখনো আসিনি। কত-দিন রাত্রে দপ দপ করে আলেয়াকে চলে বেড়াতে দেখেছি এখানে। দূর থেকে দেখে ভয়ে কেঁপে উঠেছি। জানি ওরা আলেয়া নয়; সেই খুন হওয়া মানুষগুলোই এখানে এমন করে নিশাচর হয়ে ঘুরে বেড়ায়।

আজ এই জ্যোৎস্নায়—এই দরজা খুলে খেয়ালখুশিতে বেরিয়ে এসে—এই পথ-দেখানো পাখিটাব ডাকে. নিশ্চিন্তে নির্ভয়ে আমি এই তালদীঘিটার ধারে এসে দাঁড়ালুম। চারদিকে পাহাড়ের মতো উঁচু পাড়ের ভেতর মস্ত দীঘি—ভরা জ্যোৎস্নায় অথই জল চিকচিক করছে, তার ওপর কালো কালো ডোরার মতো নেমেছে তালের ছায়া। আমি অনেকক্ষণ—অনেকক্ষণ ধরে সেই তালগাছের ডোরাকাটা চিকচিকে জলের দিকে চেয়ে রইলুম।

তারপর—

তারপর সেই আশ্চর্য দৃশ্যটা দেখলুম।

ডোরাকাটা ঝিকিমিকি জলের ঠিক মাঝখানে। পদ্ম ফুটেছে। অনেক নয়—একটা মাত্র। কী বিরাট পদ্ম—কী আশ্চর্য সুন্দর দেখতে! ভরা জ্যোৎস্নায় তার পাপড়িগুলো যেন রুপোয় গড়া। জলে অল্প অল্প ঢেউ দিয়েছে—সেই ঢেউয়ে পদ্মটা দুলছে—আর একটা করে নতুন পাপড়ি যেন মেলে দিচ্ছে সে!

আমি আর থাকতে পারলুম না। উঁচু পাড় থেকে সরসর করে নেমে এলুম অনেকখানি। তারপর ওই পদ্মটাকে তুলে আনবার জন্যে সোজা জলের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়লুম।

সাঁতার শিখিনি—সাঁতার জানি না। তবু জল কেটে আমি তীরের মতো এগিয়ে চললুম।

কিন্তু একি! যত এগিয়ে যাই, পদ্মটা আর কিছুতেই হাতের কাছে আসেনা। যখনি মনে হচ্ছে এখুনি ধরতে পারব, তখনি দেখি সেটা যেন অনেকখানি দূরে সরে গেছে। যেন ভেসে যাচ্ছে স্রোতে।

কিন্তু ভেসে তো যাচ্ছে না। ক্লান্ত নিঃশ্বাস ফেলতে ফেলতে দেখলুম পদ্ম এক জায়গাতেই স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। আকাশ-গলা অফুরন্ত জ্যোৎস্না ঝরে পড়ছে তার ওপর, দেখলুম তার পাপড়িগুলো যেন রুপো দিয়ে গড়া। অপরূপ তার গন্ধ—বাতাসে বাতাসে যেন আমায় নেশা ধরিয়ে দিচ্ছে, তার বিন্দু বিন্দু মধু জলের মধ্যে ঝরে পড়ে জলটাকেও মধুতে পরিণত করে দিয়েছে। ওদিকে আমার হাত ভেরে আসছে, পরিশ্রমে যেন বুকের ভেতর ঢেঁকির পাড় পড়ছে। প্রাণপণে এগিয়ে যেতে চাইছি পদ্মটার দিকে--চলেছি জল কেটে, কিন্তু কিছুতেই—কিছুতেই আমি পদ্মটাকে ছুঁতে পারছি না!

হঠাৎ পাড় থেকে কে আমার নাম ধরে ডাকল ঃ 'মুরারি—মুরারি'—

চমকে ঘাড় ফিরিয়ে তাকালুম। দেখলুম, দূরে উঁচু পাড়ের ওপর দাঁড়িয়ে আনন্দ। জ্যোৎস্নায় একটা চন্দনের পুতুলের মতো মনে হল তাকে। আনন্দ আবার ডাকল ঃ 'মুরারি—মুরারি'—

আমি সাড়া দিতে চাইলুম, কিন্তু অসম্ভব ক্লান্তিতে গলা দিয়ে আমার স্বর ফুটল না। পরিষ্কার শুনলুম, আনন্দ বলছেঃ 'মুরারি, ফিরে আয়—ফিরে আয়! ও পদ্ম কখনো ধরা যায় না'——

ধরা যায় না? একটা হিংস্র রোখ চেপে গেল আমার। আমি নেবই ওই

পদ্ম—যেমন করে হোক। ওটা না নিয়ে আমি ফিরব না। আমার দৈত্যের মতো শরীরটাও সব শক্তি যেন ফুরিয়ে আসছে—হৃৎপিণ্ডটা ফেটে যাবে এই রকম মনে হচ্ছে, তবু, তবুও আমি শেষ চেষ্টা করব। আর একটু। আর একটু হলেই ধরব। নাঃ—সরে গেল!

'মুরারি ফিরে আয়'—

আনন্দ ডাকছে? না—এতো রাধার গলা! আনন্দ হঠাৎ রাধা হয়ে গেল কী করে?

'আমি নেবই, এ পদ্ম আমি নেবই'—

কিন্তু তার আগে জলের তলায় কে আমায় এমনভাবে আকর্ষণ করছে? কে আমাকে এমন নিষ্ঠুর শক্তিতে টেনে নিয়ে যাচ্ছে নিচের দিকে? কেন আমি একটু একটু করে ডুবে যাচ্ছি?

ডোরাকাটা ঝিলিমিলি জলের তলায় কতগুলো লতা আমার পা জড়িয়ে ধরেছে। কিন্তু ওর লতা নয়—জীবন্ত। কঠিন নাগপাশের মতো আমায় টেনে নিয়ে চলেছে।

'ফেরো—ফেরো—উঠে এসো'—রাধা ডাকছে।

কিন্তু ফেরবার আর পথ ছিল না—আমি সেই নাগপাশের আকর্ষণে ধীরে ধীরে অতল জলের মধ্যে ডুবে গেলুম। বুকের ওপর বিশ মণ পাথরের মতো জলের চাপ আমার হৃৎপিণ্ডকে যেন গুঁড়িয়ে দিলে!

তারপর আমি ভেসে উঠলুম চেতনার সীমান্তে।

তাঁবুর ভেতরে আবছা ভোর। বাস্তবতা। জীবন। একটা কুকুর চিৎকার করছে।

নেড়ী কুকুরের ভাঙা গলার ডাকে আমার সকাল হল। সে-ই আমাকে ফিরিয়ে আনল জীবনের মধ্যে।

॥ বারো ॥

ভেবেছিলুম, আমি, ম্যানেজার আর পদ্মা ছাড়া ঘটনাটা কেউ জানে না। কিন্তু আমার ভুল ভাঙালো রাধা।

সার্কাসের বুড়ো হাতিটা যেখানে একমনে কলা গাছ খাচ্ছে, সেখানে একটা কাঠের গুঁড়ির ওপর আমি চুপ করে বসেছিলুম আর হাতিটার খাওয়া দেখছিলুম। গা আর গলার চামড়া ওর কুঁকড়ে ঝুলে পড়েছে, ছোট ছোট চোখের কোলে পিঁচুটি। পায়েব যেখানে শেকল বাঁধা থাকে, ঘষটানিতে খানিকটা ঘা হয়েছে সেখানে—কয়েকটা মাছি আর ডাঁশ ভোজের আসর বসিয়েছে, মধ্যে মধ্যে শুঁড় দিয়ে হাতিটা সেগুলোকে তাড়াতে চেষ্টা করছে। সামনের হলদে দাঁতগুলোর আগা খানিকটা কেটে নেওয়া—কে নিয়েছে জানি না।

হাতিটা বাতিলের দলে। দুদিন পরে ওকে বিক্রী করে দেওয়া হবে শুনেছি।

বুড়ো হাতি কা'রা কেনে? কেনই বা কেনে? আব কিনলে নিশ্চয়ই অকাবণে বসিয়ে বসিয়ে তার খোরাক জোগায় না। কে যেন একবার বলেছিল গুলি কবে মেবে ফেলে। হাড়পাঁজরাগুলো বিক্রী করে দেয় তারপব। হাতির হাড়েরও নাকি অনেক দাম।

আমিও তো একটা হাতির মতো। এই উনিশ বছরেই যেমন বিরাট, তেমনি ভয়ঙ্কর। যখন তিরিশে গিয়ে পেঁছুব, তখন প্রকাণ্ড হয়ে উঠব একটা পাহাড়ের মতো। আরও বড় বড় হতে হতে একেবারে বুড়ো।—একেবারে অথর্ব হয়ে যাব। তখন আমাকেও কি গুলি করে মারবে? আমিও তো একটা 'জানবর'। আমার হাড়েরও কি কিছু দাম আছে? কত দাম হতে পারে মোটের ওপর?

অথচ, আমি হাতি হতে চাইনি, মানুষ হতেই চেয়েছিলুম। ম্যানেজার সেই কথাই বলেছিল আমাকে।

একদিন আমারও সারা গা হাতিটার মতো ক্ষত বিক্ষত হয়ে যাবে; সেই সব রক্তাক্ত ক্ষতের ওপর অসংখ্য ডাঁশ এসে ভোজের আসর বসাবে। হঠাৎ মনে হল, হাতির দিক থেকে দুটো একটা ডাঁশ যেন এখনি আমার দিকে উড়ে আসতে আরম্ভ করেছে।

আমার বন্দুক থাকলে এই মুহূর্তে হাতিটাকে আমি গুলি করতুম। ও যেন আমার সামনে আমারই ভবিষ্যৎ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে—ওর আয়নায় নিজের মুখের চেহারা—না-না, নিজের পরিণতির রূপ যেন আমি প্রত্যক্ষ করছি। আমার গলা থেকে একটা তীক্ষ্ন উগ্র চিৎকার ছিটকে আসতে চাইল।

ঠিক এই সময় রাধা এল। এল অত্যন্ত সতর্কভাবে—এদিক ওদিক তাকাতে তাকাতে। কাছাকাছি কেউ নেই দেখে একটু দূরে একখানা ইটের ওপর বসে পড়ল।

আমি রাধার দিকে তাকালুম। দিনের আলোয় এই প্রথম যেন স্পষ্ট করে দেখলুম তাকে। পদ্মার মতো সুন্দরী সে নয় —কিন্তু মুখে চোখে একটা বন্য শ্রী আছে তার। ছুটন্ত ঘোড়াগুলোর ওপর যখন সে সোজা হয়ে উঠে দাঁড়ায়, চুল ওড়ে—চোখ জ্বলে, তখন একটা রূপ তার দেখেছি। আবার রাতের অন্ধকারে—বড় তাঁবুটার কোণায় রাধার আর এক পরিচয়। এই দিনের আলোতে এত কাছাকাছি যাকে দেখলুম তাকে ভারী করুণ, ভারী বিষণ্ণ বলে মনে হল। এই মুহূর্তে রাধার জন্যে একটা অর্থহীন করুণায় বুক ভরে উঠল আমার।

রাধা আস্তে আস্তে জিজ্ঞেস করলে, 'পদ্মার নেশা কাটল?'

আমি নড়ে উঠলুম একবার। জবাব দিলুম না।

'সত্যিই কি মানুষের চামড়া নেই তোমার গায়ে?'

হাসতে চেষ্টা করলুম। বললুম, 'না—আমি জন্তু।'

রাধার চোখ ঝকঝক করে উঠল।

'তোমার চেহারা দেখতে খারাপ। নইলে এ সার্কাসে কে আছে যে তাকতে-হিম্মতে পাল্লা দিতে পারে তোমার সঙ্গে? তুমি খেলা শিখলে কোন্ খেলোয়াড়ের শক্তি আছে তোমার সামনে দাঁড়াবার?'

আমি হাতিটার দিকে তাকালুম। ওরও মতো জোর দুনিয়ার আর কোনো

জানোয়ারের নেই। তবু হাতি হাতিই। ও-ও চাবুক আর ডাঙস খেয়ে খেলা দেখাবে, আস্তে আস্তে বুড়ো হয়ে যাবে, তারপর—

জবাব দিলুম না। একটা লাল বড় পিঁপড়ে এগিয়ে আসছিল পায়ের দিকে। আঙুলের ডগায় তুলে নিয়ে নখ দিয়ে সেটাকে কাটতে লাগলুম।

রাধা আর একবার চারদিকে তাকালো। সার্কাসের একটা চাকর মস্ত গাছের ডাল নিয়ে আসছিল হাতিটার জন্যে। ডালটা রেখে সে যেন কেমন করে তাকিয়ে গেল আমাদের দিকে। ওর দৃষ্টির একটা অর্থ আছে মনে হল।

রাধাও লক্ষ্য করেছিল হয়ত। চাকরটা চলে যেতে দুটো জ্বলজ্বলে চোখ আমার মুখের ওপর ফেলল।

'চলো, আমরা পালাই।'

'তারপর?'

'তারপর আমরা বিয়ে করব।'

'বিয়ে?'

খানিকটা বিস্বাদ হাসি ফুটে উঠল রাধার ঠোঁটে।

'এখনো পদ্মার জন্যে মন পড়ে আছে তোমার? ম্যানেজারের সঙ্গে শাদী হয়ে গেছে তার। চাবুক খেয়েও কি আশ মেটেনি এখনো?'

মুহূর্তের জন্যে একটা হিংস্র ইচ্ছা চমক দিলে মাথার ভেতর। হাত বাড়িয়ে প্রবল একটা আঘাত করবার প্রেরণা জাগল রাধার মুখের ওপর। কিন্তু রাধার দোষ নেই। ও আমাকে ভালোবাসে।

ভালোবাসে? কেউ কি কোনোদিন ভালোবাসতে পেরেছে আমাকে? হয়তো পিসিমা পেরেছিল। আর--আর আনন্দ।

আনন্দ! সঙ্গে সঙ্গে স্বপ্নের কথাটা মনে পড়ল। সেই জ্যোৎস্নার আলোয় আশ্চর্য উজ্জ্বল পদ্মটা। কিছুতেই ধরতে পারছি না। যতই এগিয়ে চলি, হাত বাড়িয়ে যতই ধরতে চেষ্টা করি—ক্রমাগত দূর থেকে দূরে সরে যায়। তারপর জলের তলায় সেই অদৃশ্য লতাদের জীবন্ত নাগপাশ। সে বন্ধন কিছুতেই আমি ছাড়াতে পারি না। যতই উঠতে চেষ্টা করি—ততই নিষ্ঠুর আকর্ষণে আমাকে নিচে—আরো নিচে তলিয়ে নিতে থাকে। ওই পদ্ম আমার দুরাশা। ও আমার মৃত্যু।

পাড় থেকে জীবন আমাকে ডাকছেঃ 'ফিরে এসো—ফিরে এসো। ও

পদ্মকে ধরা যায় না- ও তোমার জন্যে নয়—'

ডাক দিল আনন্দ। ডাক দিল রাধা। আনন্দ আর রাধা এক হয়ে গিয়েছিল।

আমি রাধার দিকে চোখ তুলে চাইলুম। একটা কুটিল বিদ্বেষের ঢেউ খেলে খেলে যাচ্ছে ওর মুখের পেশীতে পেশীতে। রাগ, অভিমান। পদ্মার ওপর জ্বালা। আমার জন্যে কি কোনো মেয়ের মন এমনভাবে জ্বলে উঠতে পারে?

রাধাকে আমার ভারী সুন্দর মনে হল।

হাতির জন্যে আনা ডালটা থেকে একটা কাঁচা পাতা ছিঁড়ে নিয়েছে রাধা। একমনে কী দেখছে পাতাটার ভেতরে। সেইভাবেই আস্তে আস্তে বললে, 'পদ্মার আশায় এখনো কুকুরের মতো পড়ে থাকবে এখানে?'

বললুম, 'পদ্মা নয়। আমি চিন্নুর কথা ভাবছিলুম।'

রাধা চোখ তুলল।

'চিন্নু?'

'সবাই জানে, চিন্নুর সঙ্গে তোমার বিয়ে হবে।'

'তখনো তুমি আস নি।'—ঝকঝকে ধারালো দাঁতে রাধা নিজেব ঠোঁট কামড়ে ধরল একবার ঃ 'তখন অন্য কথা ছিল।'

'কিন্তু আমার এই কুৎসিত বিশ্রী শরীরটায় তুমি কী পেয়েছ?'

'সে তুমি জানো না। আমি জানি।'

'চিন্নুর কী হবে?'

'কিছু হবে না। তার জন্যে অনেক আছে। মেয়ের অভাব হিন্দুস্তানে কোথাও নেই।'

আমি আবার চুপ করে রইলুম। রাধা এবারে একটুখানি ঝুঁকে পড়ল সামনের দিকে।

'শোনো, আর বেশিক্ষণ বসতে পারব না। চাকরটা দেখে গেল। আরো লোকের চোখে পড়লে কথা উঠবে। তোমাকে যা বলতে এসেছিলুম। আমি এ ভাবে জানোয়ারের মতো থাকতে দেব না তোমায়। আমার কিছুতেই সইবে না।'

(চৌরঙ্গীতে এই কথাটা ম্যানেজারও আমাকে বলেছিল। কিন্তু কী হল তারপরে?)

আমি বললুম, 'পালাব?'

'হাঁ, পালিয়ে যাব। আজ রাতেই।'

'আজ রাতেই?'

'দেরি করে কী হবে? তোমাকে ছেড়ে আমি আর থাকতে পারছি না। এই সার্কাসে থাকলে তোমাকে আমি কিছুতেই পাব না, তোমারও পদ্মার নেশা কাটবে না। আজই নিয়ে যাব। আমি খবর নিয়েছি। রাত দেড়টায় এই স্টেশনে মাদ্রাজ মেল আসে। সেই ট্রেনেই চলে যাব আমরা।'

'কোথায় যাব মাদ্রাজ মেলে?'

হঠাৎ রাধার দৃষ্টি যেন কেমন আচ্ছন্ন হয়ে এল। যেন স্বপ্ন ঘনিয়ে এল চোখে।

'নিয়ে যাব আমাদের দেশে। অন্ধ্রে। পাহাড়, সাগর, তালের বন আর ধানের ক্ষেত। এমন ধানের ক্ষেত তোমার বাংলা মুলুকেও নেই। সেখানে আমার মা-বাবা আছে, ছোট ভাই আছে। কিছুদিন থাকব সেখানে। যদি তোমার ভালো লাগে—থেকে যাব সেখানেই। নইলে—'

আমার মনটা ডুবে গেল। চোখের সামনে থেকে হারিয়ে গেল, মিলিয়ে গেল এই সার্কাসের তাঁবুটা। আনন্দর বাড়ীর দাওয়া। সামনে একরাশ ছবি। নারকেলের নাড়ু দিয়ে মুড়ি খাচ্ছি। সামনেই কয়েকটা স্থল পদ্মের গাছ। সকালের ফুলগুলো বিকেলে লাল হয়ে কুঁকড়ে এসেছে। আর একটা স্থল-পদ্মের ডালে এসে দোল খাচ্ছে একজোড়া বুল্‌বুলি।

চমক ভাঙল। রাধা বলে চলেছে।

'অন্য সার্কাসের দলে চলে যাব। সেখানে তুমি ক্লাউন থাকবে না—হবে সেরা খেলোয়াড় একজন। নাম হবে—টাকা হবে। তারপরে আমরা দুজনে আর একটা নতুন সার্কাস খুলব। তুমি তার মালিক হবে—আমি মাল্‌কিন। তুমি মেডেল পরে বাঘ-সিংহের খেল্‌ দেখাবে—আমি সার্কাসের দেখাশোনা করব।'

দুটোই স্বপ্ন। কোন্‌টা ভালো বুঝতে পারছি না।

রাধা উঠে দাঁড়ালো হঠাৎ। একখানা হাত চেপে ধরল আমার।

'আজ রাতে?'

ওর চোখ দুটো আমার চোখের সামনে বদলে যেতে লাগল আস্তে আস্তে। দুটো বুলবুলি উড়ছে। তারপরে এক মুঠো কাঞ্চন ফুল। বিকেলের—

সোনালী রোদে ফুলগাছের গায়ে আলোক লতার জাল। অসংখ্য প্রজাপতি। যেন কমলা লেবু রঙের আকাশটা টুকরো টুকরো হয়ে ছিঁড়ে পড়েছে—একদল প্রজাপতিতে রূপ পেয়েছে তারা।

'হাঁ—আজ রাতে।'

'তাই হবে।'

'ঠিক এক বাজে। বেরিয়ে আসবে তাঁবু থেকে।'

'আসব।'

রাধার হলুদে শাড়ী যেন বিদ্যুতের মতো খেলে গেল। পরক্ষণেই মিলিয়ে গেল রাধা। মুখ ফিরিয়ে দেখলুম, হাতিটা কেমন অপলকভাবে আমার দিকে চেয়ে আছে—যেন আমাদের সব কথা বুঝতে পেরেছে ও। জাপানী যোশিদো তারের সেই যন্ত্রটা বাজাচ্ছে। সেই অদ্ভুত সুরটা। তার কোনো অর্থ বোঝা যায় না—কেবল বুকের মধ্যে মোচড় দিয়ে উঠতে থাকে।

পায়ে আর একটা লাল পিঁপড়ে কামড়ালো। যন্ত্রণা চমকে গেল শিরায় শিরায়। কিন্তু পিঁপড়েটাকে মারতে গিয়েও আমি মারতে পাবলুম না। অনেক—অনেক দিন পরে যেন সহজ স্বাভাবিক একটা হাসির ঢেউ আমার গলার কাছে এসে আছড়ে পড়ল।

আমি কি আর ক্লাউন হয়ে থাকব না? নতুন করে বাঁচব? জীবনের ভেতর? আনন্দর ছবির ভেতর?

কিন্তু পারলুম না। তবুও পারলুম না। আমার জন্মলগ্নের নক্ষত্রটা তার অভিশপ্ত আকর্ষণ পাঠালো আমার রক্তনাড়ীতে।

ঠিক একটার সময় বেরিয়ে এসেছিলুম দু'জনে। রাধা এসেছিল ঘোমটা টেনে—কালো চাদর জড়িয়ে; আমি একটা লম্বা কোট পরেছিলুম, মাথায় মুখে জড়িয়েছিলুম গলাবন্ধ। কুকুর-ডাকা নির্জন রাস্তা দিয়ে চোরের মতো দু'জনে চলে এসেছিলুম স্টেশনে। তখন সার্কাসের সমস্ত মানুষ ঘুমে অচেতন—স্ত্রী হত্যাকারী হরেন দাসের কর্ণফুলীর গান থেমে গেছে অনেকক্ষণ আগে। কেবল সুন্দরবন আর আফ্রিকার স্বপ্ন-দেখা বাঘ-সিংহেরা চমকে ডেকে উঠছে থেকে থেকে।

স্টেশনে এলুম। টিকেট কাটলুম। ট্রেন এল।

তখন পর্যন্ত জানি, সব ঠিক আছে। জানি, অন্ধ্রের সেই পাহাড়—সমুদ্র—

ধান খেত কিংবা নতুন সার্কাসের নতুন জীবন আমার জন্যে অপেক্ষা করছে। রাধার স্বপ্ন তখনো আমার দু-চোখে জড়িয়ে ছিল।

সাবধান হওয়ার জন্য রাধাকে একটা ফিমেল্ কম্পার্টমেণ্টে তুলে আমি পেছনের গাড়ীতে উঠে বসেছিলুম। বাঁশি বাজল গাড়ী নড়ল। আর তৎক্ষণাৎ—

তৎক্ষণাৎ আমার মনে হল, এই গাড়ী আমাকে পদ্মার কাছ থেকে ছিঁড়ে নিয়ে যাচ্ছে। এ আমার মুক্তি নয়—মৃত্যু। স্বপ্নের সেই পদ্মটাকে ধরতে গিয়ে যেমন করে লতার নাগপাশ আমাকে অতল থেকে অতলে টেনে নিচ্ছিল।

আমি পাবলুম না। কিছুতেই পারলুম না। প্ল্যাট্‌ফর্ম পেরিয়ে যাওয়ার আগেই গাড়ী থেকে সোজা লাফিয়ে নেমে পড়লুম। ট্রেন রাধাকে নিয়ে দূরান্তে মিলিয়ে গেল।

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাঁপালুম কিছুক্ষণ। বুঝতে পেরেছি—আমার মুক্তি নেই। ম্যানেজার পদ্মাকে কেড়ে নিয়ে গেছে। কিন্তু পদ্মার সঙ্গে শেষ হিসাব না মেটানো পর্যন্ত আমার ছুটি মিলবে না।

কী করেছিল হরেন দাস? নিজের অবিশ্বাসিনীকে স্ত্রীকে-

পদ্মার ওপর সে অধিকার কি আমার আছে? আছে। বাঘের রক্তের সঙ্গে নিজের রক্তের নোনা আস্বাদন নিতে নিতে সে অধিকার আমি অর্জন করেছি। হাসপাতালের খাটে, ট্র্যাপিজের দোলায় পদ্মা সে অধিকারকে স্বীকার করে নিয়েছে। মহাশূন্যে ছুটতে ছুটতে যে দুটো আগুনের চিতা এসে একসঙ্গে মিলেছিল মহাপ্রলয়ের মধ্যেই তাদের শেষ।

আবার অন্ধকার কুকুর-ডাকা পথ দিয়ে আমি চোরের মতো সার্কাসে ফিরে এলুম।

* * *

রাত প্রায় শেষ হয়েছে। সেই কখন থেকে নিজের কথা ভাবতে শুরু করেছিলুম। ছেলেবেলার দিনগুলি দিয়ে শুরু করে ভাবনার পথ বেয়ে কতদূর পর্যন্ত এগিয়ে এলুম। কিন্তু আর নয়—আর নয়। এবার আমার শেষ কথাকে সারা করবার পালা এসেছে।

দূরে একটা গাছে কঁকিয়ে কঁকিয়ে অদ্ভুতভাবে কেঁদে উঠেছে শকুনের ছানা। হয়তো খিদে পেয়েছে ওদের। কিন্তু কাল সকালে এইখানেই ওদের খাবার মিলবে। চাপ চাপ রক্তে, তালপাকানো একরাশ মাংসপিণ্ডে।

ঠাণ্ডা রেল লাইনটার ওপর শুয়ে আছি মাথা পেতে দিয়ে; সিগ্‌ন্যালের নীল বাতি জ্বলছে, গাড়িটা আসতে কত দেরি আছে আর? শকুনের ছানারাও কি প্রতীক্ষা করছে আমার মতো? প্রহর গুণছে?

ঃ 'আমার দেশে নীল পাহাড় দিক ছেয়ে থাকে। তার গায়ে ঢেউ ভাঙে নীল সায়র। যত দূরে চাও ধান আর ধান। নাই-বা আমরা ফিরে গেলুম সংসারে? কী হবে বেদিয়ার মতো ঘুরে ঘুরে?' ঘোড়ার ঘূর্ণির মতো গতির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে যার চো'খ আগুনের মতো জ্বলে সে নয়; তাঁবুর আলো-আঁধারিতে যে বাঘিনী হয়ে যায় সে-ও নয়। আর এক রাধা আমাকে বলেছিল। প্ল্যাট্‌ফর্মের আলোয় দেখেছিলুম, ঘোমটার ফাঁকে জলে চিকচিক করছে দৃষ্টি।

রাধা আমাকে আকাশ-ছোঁয়া ছবির মধ্যে নিয়ে যেতে চেয়েছিল। সেই ছবিতে পাখি কাঞ্চন ফুল আর মায়ের মুখের রঙ। কিন্তু আমি সেখানে যেতে পারলুম না। আমার জন্যে ও নয়। আমি জীবনকে ব্যঙ্গ করতে পারি, কালো রঙের পোঁচ্ টেনে দিতে পারি ছবির ওপর। আর আমি কিছুই পারি না।

রাধা তার মানুষকে ঠিক খুঁজে নেবে। হয়তো আবার ফিরে আসবে চিন্নুর কাছেই।

ওর ট্রেন এখন কোথায়? কী ভাবছে আমার কথা? আমাকে কি খুঁজে দেখেছে এর ভেতরে?

জানি না। জানতে চাই না। তুম্‌সে মেরী প্যার হো গয়ী! ও নেশায় জড়ানো মাতালের প্রতাপ। আমাকে কেউ ভালোবাসতে পারে না। আমি হাসাতে পারি, লোকে হাসতে পারে। ব্যাস—এই পর্যন্তই। রাধার কথা আর আমি ভাবন না।

পদ্মা।

হাঁ, পদ্মাই। আজও একটু পরে ট্র্যাপিজে দুলতে আসবে সে। নীচে আজও নেট থাকবে না—নেট রাখবার কথা মনেও হবে না কারো। স্টেশন থেকে পালিয়ে এসে এক মুহূর্তও সময় নষ্ট করিনি আমি। অনেকক্ষণ ধরে—অনেক যত্নে দড়ির বারো আনাই কেটে রেখে দিয়েছি শূন্য থেকে ত্রিশ হাত দূরে ছিটকে পড়ার আগে পর্যন্ত তা টেরও পাবে না পদ্মা।

ট্রেন আসছে নাকি? অনেক দূরে—রেলের ব্রীজের থেকেও আরো অনেক দূরে—জঙ্গলের মাথার ওপর খানিকটা আভা পড়েছে যেন। আর ক' মিনিট? এই পথটুকু এগিয়ে আসতে এক্সপ্রেস্ গাড়ীটার কতক্ষণ সময় লাগবে?

সেই শকুনের বাচ্চারা আবার কেঁদে উঠল। ওরাও অপেক্ষা করছে।

ট্রেন আসছে। আলোটা স্পষ্ট হয়ে উঠছে। গমগম শব্দ শুনছি রেলের ব্রীজের ওপর—যেন অনেক দূরে থেকে আমাদের সার্কাসের জন্তুরা গর্জন করে উঠছে।

ঃ তোমাকে পুরো মানুষ হতে হবে।

ঃ তুমি ক্লাউন নও।

ঃ সবচেয়ে বড় খেলোয়াড় হতে হবে তোমাকে।

ঃ খেলার দল খুলব। তুমি তার মালিক, আমি মালকিন।

পারি? ফিরে যেতে পারি রাধার কাছে? একবার মাথাটা আমার নড়ে উঠল লাইনেব ওপর। এখনো কি সময় আছে আমার? না—আমি ক্লাউন। আর ক্লাউন বলেই তো এমন হাস্যকরভাবে পদ্মার জালে আমি বাঁধা পড়েছি। আর আমার সেই বিদূষকের ভূমিকা দেখে তাঁবুতে ম্যানেজারের বুকের ভেতর এখন হয়তো হেসে উঠছে পদ্মা।

হাসুক। কাল ট্র্যাপিজে ওঠবার পর থেকে হাসির সুযোগ সে আর পাবে না। যে হরেন দাস নিজের স্ত্রীকে খুন করেছিল, সে-ই আমায় পথ দেখিয়েছে।

কিন্তু আমারও তো হাসির যন্ত্র আর বাজবে না। যদি হাসাতেই না পারি, তা হলে পৃথিবীতে আমারও তো কোনো ভূমিকা নেই। আমি অনাবশ্যক—সম্পূর্ণই নিরর্থক।

ট্রেন আসছে। ওই যে আগুন ঝরানো চোখ ছুটে আসছে তার।

এসে পড়ল প্রায়—হয়তো আর মিনিটখানেকও সময় দেবে না। তবু এখনো বিদূষকের আশা আছে। লোহার চাকার শেষ ঘায়ে হাসিটা হেসে উঠব বলে অপেক্ষা করছি।

কেমন লাগবে চাকার ছোঁয়া? না—না রাধা নয়। পদ্মার ঠোঁটের মতো? তারও চাইতে তীব্র? তার চেয়েও বেশি নেশা লাগিয়ে দেবে মুহূর্তের জন্যে?

থরথরিয়ে লাইনটা কাঁপছে। উড়ে আসছে আলো আর শব্দর তুফান। সেই তুফানটা এসে পড়বার তিন সেকেন্ড আগে আকাশ-ছেঁড়া একটা উল্কার আলো নিঃশব্দ হাসিতে ছুটে গেল চোখের ওপর দিয়ে।

আমি ওটাকে চিনি।

আমার জন্মলগ্নের নক্ষত্রটা॥

